باللغة البنغالية

তাওহীদ পুনরুদ্ধার

সংকলন ও গ্রন্থনা:

মুহাঃ আবদুল্লাহ্ আল কাফী

الرجوع إلى التوحيد

إعداد:

محمد عبد الله الكافي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيص
The cooperative office for call and guidance At Al-Eys
Tel: 04-3240024 Fax: 04-3240650 P.O Box 76 K.S.A

তাওহীদ পুনরুদ্ধার

সংকলন ও গ্রন্থনা:

মুহা: আবদুল্লাহ্ আল কাফী

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

শিক্ষক, আল্ ঈস (ইয়ানবো) ইসলামী সেন্টার, সউদী আরব

প্রথম প্রকাশঃ ১৪৩১ হিঃ/ ২০১০ইং

অর্থায়নঃ ইয়ানবো ও আল ঈস ইসলামী সেন্টারে অধ্যয়নকারী প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইগণ।

সূচীপত্র الفهارس

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد:

বর্তমান বিশ্বের আনাচে-কানাচে প্রায় দেড়শত কোটি মুসলমান বসবাস করে। মুসলমানদের এই বিরাট সংখ্যা নিঃসন্দেহে একটি আনন্দের বিষয়। আজ মুসলমানগণ বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে তাল মিলিয়ে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিযোগিতার সাথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে মুসলমানগণও পিছিয়ে নেই। কিন্তু তাদের এই প্রতিযোগিতা তাদেরকে তাদের মূল ও আসল প্রতিযোগিতা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। করে তুলেছে তাদেরকে বস্তুবাদী ও ভোগবিলাসী। ফলে মুসলমান নাম ধারণ করেও তাদের অনেকের আচরণ অমুসলিম-কাফেরদের সাথে অনেকাংশে মিলে যায়; বরং কোন কোন সময় অনেক মুসলমানের দিকে তাকালে তাকে চেনা যায় না সে কোন জাতির অন্তর্ভূক্ত? তার কার্যাবলীর দিকে দেখলে বুঝা যায় না সে কোন সভ্যতা ও কালচারের অনুসরণ করছে? প্রকৃতভাবে তার সত্তাগত ও জাতিগত পরিচয়ই বা কি? তাদের অনেকের কথা-বার্তা, চাল-চলন, পোশাক-আশাক ইত্যাদি দেখে বুঝার উপায় নেই তারা কি মুসলমান না হিন্দু না খৃষ্টাননা ইহুদী।

আবার মুসলমানদের মধ্যে যারা ইবাদত-বন্দেগীতে নিয়োজিত আছে, তারা অধিকাংশই শতধা বিভক্ত। বিভন্ন তরীকা ও মাযহাবের বেড়াজালে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে নিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করছে। তাদের কর্মপদ্ধতি দেখলে বুঝা যায় না তারা প্রকৃত পক্ষে কার বিধানের অনুসরণ করছে? কোন নবীর উম্মত হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে?

অধিকাংশ মুসলমান আজ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে শাখাগত শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কেউ আবার শুধুমাত্র চারিত্রিক সংশোধন ও নির্দিষ্ট কয়েকটি ইবাদতের মাঝে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। বিরোধ হতে পারে এমন বিষয় থেকে দূরে থেকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র ফযীলতের বিষয়গুলো রপ্ত করে তার মাধ্যমেই নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তার উপরেই চলে চিন্তা-ফিকির এবং মেহনত ও গবেষণা। কেউ ওযীফা ও যিকির-আযকার নিয়েই সর্বদা তালীম দেন। বাইয়াতের মাধ্যমে মুরীদান বৃদ্ধিতেই গুরুত্বারোপ করেন বেশী। হাকীকত ও মারেফত এবং শরীয়ত ও তরীকতের দীক্ষাই তাদের মূল বিষয়; যদিও মারেফতের গুরুত্ব সেখানে সর্বাধিক এবং শরীয়ত গৌণ বিষয়। কিভাবে সহজে জান্নাত যাওয়া যাবে, কঠিন কিয়ামতে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তার সহজ পথ বের করে মানুষকে সেদিকেই আহবান করতে তারা সর্বদা সচেষ্ট।

আরেক দল লোক মানুষকে আহবান করেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে পশ্চাত্য রাজনীতির গোলক ধাঁধায় বেঁধে সেই পথে অগ্রসর হতে। দল-মত ও আকীদা-বিশ্বাস যার যা থাকুক না কেন সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের রায় নিয়ে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। সকল মানুষ এসে যাবে ইসলামের আওতায়। ফলে বাস্তবায়ন করা যাবে ইসলামী বিধি-নিষেধ এবং প্রয়োগ হবে ইসলামের দন্ডবিধি।

অথচ একটি বিষয় এ সকল দলের কাছে উপেক্ষিত। তাদের দাওয়াত-তাবলীগ, প্রশিক্ষণ-তালীম প্রভৃতিতে তা অনুপস্থিত। আর তা হচ্ছে **তাওহীদ**। তাওহীদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অনেক প্রতিথযশা আলেম ও বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ ও পন্ডিতের মধ্যে কোন স্বছ-ধারণা নেই। তাওহীদের পরিচয় কী অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। মানুষের মধ্যে অনেকের ধারণা ইসলাম শিখতে হলে পীর ছাড়া উপায় নেই, আল্লাহকে চিনতে ও পেতে হলে পীরের বিকল্প নেই। বিপদ মুক্তি, সন্তান কামনা, রোগ মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে পীর ছাড়া পথ নেই। এমনকি মানুষকে এই পীরেরা শিখিয়েছেন যে, রোজ হাশরে ভীষণ কিয়ামতের মাঠে পীর ছাড়া নাজাত পাওয়া যাবে না, গুনাহ মাফ পাওয়া যাবে না, জান্নাতও পাওয়া যাবে না, তাই তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া মুক্তির উপায় নাই। আর মানুষও তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে ছুটে চলেছে তাদের পদসেবা করতে, তাদের ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও

কার্যকলাপ বাস্তবায়ন করতে। তারপরও মানুষ দাবী করে আমরা ওতাওহীদী জনতা; কিন্তু তাওহীদের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি? চলমান জীবনে, দৈনন্দিন ইবাদতে ও কর্মে কিভাবে তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে হবে তার চিত্র অধিকাংশ মানুষের কাছে অনুপস্থিত। আজ মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে তাওহীদই হচ্ছে সর্বাধিক উপেক্ষার বিষয়।

ফলে মুসলমানদের মধ্যে শির্ক দাপটের সাথে বিচরণ করছে। ইবাদত-বন্দেগী, শিক্ষা-দীক্ষা, মসজিদ-মাদরাসা, দাওয়াত-তাবলীগ, রাজনীতি, শাসন কার্য, কথা-বার্তা, সুখ-দু:খ, বিপদ-আপদ, বিবাহ-শাদী তথা জীবনের প্রায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্র তাওহীদ শুন্য এবং শির্কের অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কিন্তু মানুষ তা মোটেও অনুধাবন করতে পারে না। তাওহীদ শুন্য জীবন পরিচালনা করেও তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আর বলতে থাকে আমরা ইসলামী সমাজের মানুষ, আমরা তাওহীদী জনতা!

প্রিয় পাঠক! এই কারণে আমি **তাওহীদ পুনরুদ্ধার** নামে এ পুস্তকটি প্রস্তুত করার ইচ্ছা করেছি। যাতে থাকবে কিভাবে মুসলমান সমাজের সর্বস্তরে তাওহীদ আজ উপেক্ষা ও অবেহেলার স্বীকার হচ্ছে তার বাস্তব ও প্রামাণ্য তথ্য। থাকবে শির্কের অন্ধকার গহ্বর থেকে বের হয়ে তাওহীদের প্রকৃত পরিচয় ও তা পুনরুদ্ধার করার সঠিক ও সহজ ব্যবস্থাপনা। বিশেষ করে বাংলাদেশের হক্কানী পীর বলে খ্যাত চরমোনাই পীর ইসহাক সাহেবের লিখিত কয়েকটি বই থেকে কিছু শিরকী বক্তব্যে উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক সেগুলো

পর্যালোচনা করব। সেই সাথে কুরআন-হাদীছের বক্তব্য কি তা জাতির সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। কাউকে হেয় বা খাটো করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং সত্য উদঘাটন ও সতর্কী করণের জন্যে আমি প্রচলিত তাওহীদ বিরোধী শির্কের কর্মকান্ডগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালাব। কেননা রাতের অন্ধকার আছে বলেই আলোর মর্যাদা বুঝা যায়। অজ্ঞতা না থাকলে জ্ঞানের মূল্য বুঝা যেতো না। এ জন্যে ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেনঃ ইসলামের কিনারাগুলো একটি একটি করে ভেঙ্গে যাবে, যখন মানুষ শুধু ইসলাম জানবে কিন্তু জাহেলিয়াত জানবে না। তাওহীদ জানতে ও চিনতে চাইলে শির্ক কাকে বলে তা জানতে হবে, কি কি কাজে শির্ক হয় তা বুঝতে হবে। তাহলেই তাওহীদের আলোকে জীবন গড়া যাবে, শির্কের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

মিথ্যুকের মুখোশ উম্মোচন করাই আমার ধর্ম
বিদআতীর জড় কাটাই আমার কর্ম,
তাওহীদের সৈনিক সে তো বড় যোদ্ধা
শির্ক পঙ্কিলতা দমনে সচেষ্ট সর্বদা।

হে আল্লাহ্! আমার এই প্রচেষ্টাকে তোমার তাওহীদ রক্ষার কাজে সামান্য খেদমত হিসেবে কবুল করে নিও। এ দ্বারা তাওহীদ পিপাসু মানুষকে এবং তাওহীদ বঞ্চিত পথ হারা সমাজকে উপকৃত করো। আর শির্ক হতে বেঁচে ও মুশরেকদের থেকে সতর্ক থেকে তোমার তাওহীদের উপর মৃত্যুঅবধি সবাইকে সুদৃঢ় ও অবিচল রেখো। আমীন॥

এ বইটি প্রস্তুত করার ব্যাপারে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং ছাপানোর কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা করছি শাইখ আব্দুর রব আফফান ও শাইখ আবদুল্লাহিল হাদীর। তারা উভয়েই বইটির সম্পাদনা করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা করছি ইয়ানবো রয়েল কমিশন, ইয়ানবো আল বাহার এবং আল ঈস ইসলামী সেন্টারের শিক্ষার্থী প্রবাসী ভাইদের যাদের অর্থানুকুল্যে বইটি ছাপানো হয়েছে। আল্লাহ্ যেন তাঁদের সকল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করে তাদের জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নেন এবং রোজ কিয়ামতে নাজাতের উসীলা করে দেন। যে পিতা-মাতার অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ দুআ ছাড়া আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই সামান্য খিদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হত না, মহান আল্লাহ্ পূর্ণ প্রতিদান স্বরূপ তাঁদের ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউসে করে দিন। আমীন।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার নিকট নিবেদন, সহীহ্ দলীল ভিত্তিক যে কোন সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করা এবং নির্ভূলভাবে আক্বীদা ও আমল পরিচালনা করা, তাই আমার এই বইয়ে যদি সেরকম কোন ভূল দেখা যায় তবে জানাতে কার্পণ্য করবেন না এবং নিজেকে ছোয়াব থেকে বঞ্চিত

করবেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কল্যাণের পথ প্রদর্শক, আমলকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান লাভ করে।" (তিরমিযী)

বিনীত, মুহা আবদুল্লাহ্ আল কাফী
mohdkafi12@yahoo.com

তাওহীদ পুনরুদ্ধার

১) ইবাদত-বন্দেগীতে তাওহীদ পুনরুদ্ধারঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর জান্নাত লাভের আশায় ইবাদত করতে হয়। আল্লাহর ক্রোধ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যেই সৎ কর্ম সম্পাদন করতে হয়। তাহলেই সে ইবাদত হবে তাওহীদ ভিত্তিক এবং গ্রহণযোগ্য। তাই আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেনঃ

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾

তাদেরকে তো শুধু এ আদেশ করা হয়েছে যে, তারা ধর্মকে একনিষ্ঠ করে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ্: ৫) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ)

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ইখলাস ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য কৃত আমল কবুল করেন না।[১]

কিন্তু উক্ত ইবাদতের মাধ্যমে যদি মানুষের প্রশংসা-ভালবাসা বা বাহাবা ও সন্তুষ্টি লাভ অথবা দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের সামান্যতম ইচ্ছা থাকে তবে তা তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। ফলে উক্ত ইবাদত আল্লাহর কাছে হবে প্রত্যাখ্যাত; বরং তা রূপান্তরিত হবে শির্কে। যদিও উহা ছোট শির্কের অন্তর্ভূক্ত। এ ধরণের ইবাদতকে ইসলামের পরিভাষায় রিয়া বলা হয়।

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের এক শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ের লোকের মধ্যে এই রিয়ার চর্চা ব্যাপক আকারে দেখা যায়। অনেক মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে ২/১ ওয়াক্ত নামায অনায়াসেই ছেড়ে দেয়। বিশেষ করে ফজরের নামাযের সময় তাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। আবার কেউ শুধুমাত্র জুমআ বা দুঈদের নামায আদায়

---

[১] . আবু উমামা (রাঃ) থেকে আবু দাউদ ও নাসাঈ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, দ্রঃ সহীহ তারগীব ও তারহীব হা/৭

করেই পরিতৃপ্ত। কেননা এর মাধ্যমে অন্ততঃ মানুষ একথা বলবে না যে, লোকটা এত খারাপ যে জুমআর নামায তো পড়েই না দুঈদের নামাযও পড়ে না। অথচ সে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অনায়াসে ছেড়ে দিচ্ছে তাতে কারো মাথা ব্যথা নেই উচ্চ্য-বাচ্চ্য নেই।

যে ব্যক্তি ২/১ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয় তার অবশিষ্ট নামায, জুমআ ও দুঈদের নামায যে কেবল মানুষ দেখানোর জন্যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সে যদি সত্যই আল্লাহ্‌কে দেখানোর জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টির আশায় ইবাদত করত, তবে যে আল্লাহ্ জুমআ বা দুঈদের নামাযের বিধান দিয়েছেন তিনিই অন্যান্য নামাযও ফরয করেছেন। এরকম সুবিধাবাদী মুসল্লীদেরকে কুরআন-হাদীছের ভাষায় মুনাফিক বলা হয়েছে। আর মুনাফেকদের কাজ শুধু মানুষকে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলমান সমাজে টিকে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

নিশ্চয় মুনাফেকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায়, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোকা দিবেন। ওরা যখন নামাযে দন্ডায়মান হয় তখন অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে দেখানো। এই কারণে তারা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।" (সূরা নিসাঃ ১৪২) অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করে।

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ،الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾

অতঃপর মুসল্লীদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা নামাযের বিষয়ে উদাসীন[১], যারা মানুষকে দেখানোর জন্যে নামায আদায় করে।" (সূরা মাউনঃ ৪-৬)

আবার অনেকে বড় বড় দান-সাদকা করে মানুষের কাছে প্রশংসা শোনার জন্যে। তাই দানকারীর নাম প্রচার না করা হলে তার মন খারাপ

---

[১] . মুসআব বিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (সা'দ)কে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা! এই আয়াতটি সম্পর্কে আপনার কি মত? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নামায আদায় করতে গিয়ে তার মধ্যে উদাসীনতা আসে না? তিনি বললেন, তুমি যা মনে করেছো তা এখানে উদ্দেশ্য নয়; এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাযের সময়কে বিনষ্ট করা। খেলা-ধুলা বা আজে-বাজে বিষয়ে লিপ্ত থাকে এভাবে নামাযের সময় পার হয়ে যায়।-মুসনাদ আবু ইয়ালা [দ্রঃ সহীহ্ তারগীব ও তারহীব হা/৫৭৬। বর্ণনাটি মাওকূফ সূত্রে হাসান]

হয়। অনেকে টাকা-পয়সা খরচ করে হজ্জ-ওমরা পালন করে আসে হাজী নাম ফুটানোর জন্যে। হজ্জ করে এসে লোকেরা তাকে হাজী সাহেব না বললে মন খারাপ হয়। এ ধরণের আরো যে সমস্ত আমলে মানুষের উদ্দেশ্য থাকে তার কোনটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত আমলকারীকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেনঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি রিয়া এবং শ্রুতির উদ্দেশ্যে কোন আমল করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার গুপ্ত অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন এবং সকলের সম্মুখে তাকে লাঞ্ছিত করবেন।[১]

---

[1] . মুসনাদে আহমাদ হা/২১২৯০। দ্রঃ সহীহ তারগীব হা/২৪

[১] . মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ যে তার আমলে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করে। হা/ ৫৩০০।

[1] . হাদীছটা এরকমঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট বর্ণনা করেছেনঃ

"কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বান্দাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করার জন্য অবতরন করবেন। প্রত্যেক জাতি সে সময় হাঁটুর উপর ভর করে নতজানু অবস্থায় থাকবে। সর্বপ্রথম যাকে ডাকা হবে সে এক ব্যক্তি যে কুরআনের প্রচুর জ্ঞানার্জন করেছিল, আর এক ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছিল এবং এক ব্যক্তি যে অঢেল সম্পদের অধিকারী ছিল। সম্মানিত মহান আল্লাহ কুরআনের কারীকে বলবেন, আমার রাসূলের উপর আমি যা নাযিল করেছিলাম তার জ্ঞান কি তোমাকে দান করি নাই? সে বলবে, হাঁ হে আমার প্রতিপালক। তিনি বলবেন, যে জ্ঞান অর্জন করেছ সে অনুযায়ী কি

বরং আল্লাহ্ তার আমলকে প্রত্যাখ্যান করে বলবেনঃ

আমল করেছ? বলবে আমি রাত-দিন তা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি তার হক আদায় করেছি। সম্মানিত মহান আল্লাহ তাকে বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। আর মহান আল্লাহ বলবেনঃ বরং তুমি তো ইচ্ছে করেছিলে যে, (তোমাকে) বলা হবে উমুক ব্যক্তি ক্বারী। আর তা তো বলাই হয়েছে। (মুসলিমের বর্ণনায় আছে, "অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। তখন তাকে মুখের ভরে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

সম্পদশালী ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। সম্মানিত মহান আল্লাহ তাকে বলবেনঃ আমি কি তোমাকে সম্পদের প্রাচুর্য দান করিনি? এমনকি কারো মুখাপেক্ষী করে তোমাকে রাখিনি? সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার রব। তিনি বলবেনঃ তোমাকে যা দান করেছিলাম তা কোন কাজে ব্যবহার করেছ? সে বলবেঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতাম এবং দান-সাদকা করতাম। আল্লাহ তাকে বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। সুমহান আল্লাহ বলবেনঃ বরং তুমি তো ইচ্ছে করেছিলে যে, তোমাকে বলা হবে উমুক ব্যক্তি দানশীল। আর তা তো অবশ্যই বলা হয়েছে। (মুসলিমের বর্ণনায় আছে, "অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। তখন তাকে মুখের ভরে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেনঃ কি কারণে নিহত হয়েছ? সে বলবে, হে প্রভূ! আপনার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য আপনি আদেশ করেছিলেন, তাই লড়াই করে নিহত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ, ফেরেশতারাও বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ বলবেনঃ বরং তুমি তো ইচ্ছে করেছিলে যে, (তোমাকে) বলা হবে উমুক ব্যক্তি বীর যোদ্ধা। আর তা তো অবশ্যই বলা হয়েছে। (মুসলিমের বর্ণনায় আছে, "অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। তখন তাকে মুখের ভরে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।")

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাঁটুর উপর আঘাত করে বললেনঃ "হে আবু হুরায়রা! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এরা হল তিন ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে যাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জলিত করা হবে।" (তিরমিযী)

)أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ(

আমি শির্ককারীদের শির্কী আমল থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করে তাতে আমার সাথে অন্যকে অংশী করবে, আমি তাকে এবং তার শির্কী আমলকে পরিত্যাগ করব।[১]

আর এই কারণে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম যাদের দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করবেন তারা কিন্তু সাধারণ অপরাধী নয়। যারা ব্যভিচারী, মদপানকারী, সুদখোর, ঘুষখোর, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী প্রভৃতি ছিল, সবার আগে এই পাপীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না। বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, বরং যারা সমাজের চোখে সবচেয়ে বড় নেক কাজ আঞ্জাম দিয়েছে তাদেরকেই সকলের আগে উল্টো করে নাকের ভরে ছেঁচড়ে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।[২]

২) শিক্ষা-দীক্ষায় তাওহীদ পুনরুদ্ধারঃ

আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম যে বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন তা হচ্ছে তাওহীদ বিষয়ক শিক্ষা। তিনি এরশাদ করেনঃ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ অতএব তুমি শিক্ষা অর্জন কর একথার যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯) তিনি আরো বলেনঃ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى অতঃপর যে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সেই সুদৃঢ় হাতলকে আঁকড়ে ধরবে।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৬) অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহীদকে আঁকড়ে ধরবে।

এই কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দাওয়াতী জীবনের শুরুতেই মানুষকে এই তাওহীদের শিক্ষা প্রদান শুরু করেছেন। আর এর উপরেই নবুওতী জীবনের মূল্যবান তেরটি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন।

মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামানের গভর্ণর হিসেবে প্রেরণ করার সময় নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটার অনুসরণে বর্তমানেও আমাদেরকে সিলেবাস তৈরী করতে হবে। তিনি তাঁকে বলেছিলেনঃ

তুমি কিতাবধারী জনগোষ্ঠি (খৃষ্টান অধ্যুষিত) এলাকায় যাচ্ছ, তুমি সর্ব প্রথম মানুষকে আহ্বান করবে কালেমাওলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিতে। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানাবে যে আল্লাহ্ তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে তাদেরকে বলবে আল্লাহ্ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তথাকার দরীদ্র জনগণের মাঝে তা বিতরণ করা হবে...। -[১]

একথা হতেই পারে না যে, এই কালেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে, তার কোন অর্থ, তাৎপর্য ও দাবী থাকবে না। এর জন্যে কোন শর্তমালা থাকবে না। কি কাজ করলে এ কালেমা নষ্ট হতে পারে তার কোন কারণ থাকবে না। যদি তাই হত তবে মক্কার কাফেরদের এই কালেমা পাঠ করতে কোন বাধা থাকতো না। তারা ছিল আরব জাতি, এর নিগূঢ় তত্ত্ব তারা বুঝতো এজন্যেই তারা তা পাঠ করতে অস্বীকার করেছিল। তারা এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল যে এটা পাঠ করলে আল্লাহর সাথে কাউকে

---

[১] . বুখারী ও মুসলিম, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

শরীক নির্ধারণ করা যাবে না। কারো কাছে প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করা যাবে না। কাউকে মাধ্যম নির্ধারণ করা যাবে না। অথচ তারা এগুলো করতো। তারা গাইরুল্লাহর মাধ্যমে বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করতো, গাইরুল্লাহকে ডাকতো। আর গাইরুল্লাহর জন্যে নযর-মানত, পশু কুরবানী, অসীলা ধরা ইত্যাদি তো ছিলই। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾

তাদেরকে যখন বলা হত, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল, তখন তারা অহংকার করত আর বলত, আমরা কি একজন পাগল কবির কথামত আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (সূরা সাফ্ফাতঃ ৩৫-৩৬)

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সমস্ত বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। মসজিদের ইমাম ও ওয়ায়েজীনদের মুখে এ ধরণের কোন কথা তেমন শোনা যায় না। মোটকথা শিক্ষা সিলেবাসে, ওয়াজ-নসীহতে তাওহীদ অবহেলিত ও উপেক্ষিত। যার কারণে যে মসজিদ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত

করার জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানে হয় শির্কের চর্চা।[১] ইলমে দ্বীনের শিক্ষাগারের পাশাপাশি শির্কের ঘাঁটিও সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ সমস্ত মসজিদ ও মাদ্রাসার পাশে শোভা পাচ্ছে কবর ও মাজারের সুরোম্য অট্টালিকা। অনেক ক্ষেত্রে মসজিদ-মাদ্রাসার চাইতে উক্ত মাজারের চাকচিক্য, সৌন্দর্য ও কারুকার্য চোখে পড়ার মত অবাক হওয়ার মত। অথচ ঐ সমস্ত মাজারে অহরহ শির্কের চর্চা হচ্ছে।

---

[১] . যেমন, অনেক ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে বসে 'সোলেমানী তাবীজ' বা 'নাফেউল খালায়েক' প্রভৃতি বই থেকে তাবীজ-কবচ লিখে থাকেন। শির্কী ও কুফরী বাক্য পাঠ করে জিন-ভুত ছাড়ানোর চিকিৎসা করে থাকেন। এগুলো সবই শির্ক চর্চা। উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা দশজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট আগমণ করল। তিনি তাদের মধ্যে নয়জনের কাছে বায়আত নিলেন কিন্তু একজনের বায়আত না নিয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন। তারা আরয করল, কি ব্যাপার তার? তিনি বললেনঃ তার হাতে তাবীজ বাঁধা আছে। লোকটি তৎক্ষণাৎ তাবীজটি কেটে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কাছে বায়আত নিলেন। এরপর বললেনঃ "যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করবে সে শির্ক করবে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম। সিলসিলা সহীহা হা/৪৯২) তাবেঈ ঈসা বিন হামযা একদা সাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন উকাইম (রাঃ)কে শুশ্রূষা করার জন্যে গেলেন। তাঁর মুখমন্ডল ও সারা শরীর ফুলে লাল বর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন আপনি একটা তাবীজ ব্যবহার করেন না কেন? তিনি বললেনঃ নাউযুবিল্লাহ্.. এর চাইতে মৃত্যুই বেশী উত্তম। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন কিছু (গলায় বা হাতে) লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।" (তিরমিযী, হাদীছটি হাসান দ্রঃ ছহীহ তিরমিযী হা/ ২০৭২) সাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) জনৈক রুগীর সুশ্রূষা করার জন্যে গিয়ে দেখেন সে তার বাহুতে সুতা বেঁধে ব্যবহার করেছে। তিনি তা কেটে ফেললেন এবং বললেন, এ তাবীজ থাকাবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে আমি তোমার জানাযা পড়তাম না। (তাফসীর ইবনে আবী হাতেম)

মানুষ বিপদ উদ্ধারের জন্যে, সাহায্য চাইতে, জিন-ভুতের উপদ্রব থেকে বাঁচার আশায়, রোগ মুক্তি কামনায়, সন্তান পাওয়ার আকংখ্যায় সে সকল মাজারে ধর্ণা দিচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে নযর-মানত, পশু কুরবানীসহ অসংখ্য শির্কী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে বাধা দেয়ার মত কেউ নেই। বুঝানোর মত কোন ব্যবস্থা নেই।

এ সমস্ত মাদ্রসায় পাঠ্য সিলেবাসে **তাওহীদ** নামক কোন সাব্‌জেক্ট খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামী আকীদা কি? কিভাবে আকীদা রক্ষা করা যায়? শির্ক কাকে বলে? কোন্ কোন্ কাজ করলে মানুষ শির্কে লিপ্ত হতে পারে এবং তার ঈমান নষ্ট হতে পারে ইত্যাদি কোন কিছুই ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় না। যার কারণে ঐ বিষয়ে অজ্ঞ থেকেই মাসআলা-মাসায়েল শিখে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষ করেন। টাইটেল বা দাওরায়ে হাদীছ পাশ করে কর্ম জীবনে প্রবেশ করে, সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে চলমান শির্কের আখড়া কবর, মাজার বা দরবার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না, বলতে জানেন না। অনেক সময় তাদের অনেকেই

কোন না কোন মাজারের খাদেম বনে যান বা নিজেই একটি দরবার শরীফ খুলে ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ-কবচ দিয়ে, জিন-ভুত ছাড়িয়ে রমরমা ব্যবসা শুরু করে দেন।

তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাদেরকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে **তাওহীদ** সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া হয়নি। শির্ক এবং তার বাহন ও উপকরণ থেকে কোনরূপ সতর্ক করা হয়নি।

সত্যিকারভাবে ঐ সমস্ত মসজিদে যদি তাওহীদের দারস চালু থাকতো, ঐ সমস্ত মাদ্রাসায় যদি তাওহীদের জ্ঞান দান করা হত তবে কখনই তাওহীদ ও শির্ক পাশাপাশি থাকতে পারত না। মসজিদ-মাদ্রাসা ও মাজার সহবস্থান করতে পারত না। হয় তাওহীদী শিক্ষায় বলিয়ান হয়ে ঈমানদার জনগণ ও ছাত্র সমাজ তার বিরুদ্ধে দূর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলত, ফলে তাওহীদী প্রতিষ্ঠান মসজিদ-মাদ্রাসা অবশিষ্ট থাকত এবং শির্কের আখড়াগুলো ভেঙ্গে ফেলা হত, অন্যথা মসজিদ-মাদ্রাসা অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যেত।

কিন্তু আফসোস, তা হবে কি করে? ঐ মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর অস্তিত্বই তো হয়েছে মাজারকে কেন্দ্র করে, মাজারের বরকতে(!) মাজারে সমাধিস্থ আল্লাহর ওলীর (?) দুআর বরকতে ও তার ফায়যের অসীলায়(!) ঐ সমস্ত মসজিদ ও মাদ্রাসা তো আল্লাহর উদ্দেশ্য তৈরী হয়নি। তৈরী হয়েছে মাজারের ওলীর উদ্দেশ্যে। তাই ইমাম-মুআজ্জিনের বেতন, মসজিদের সংস্কার ও পরিচর্চা, মাদ্রাসার উন্নতী, লিল্লাহ বোডিং, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় খরচের সিংহভাগ সংগ্রহ হয় মাজারের দান বাক্স থেকে উদ্বৃত্তঅর্থ থেকে।[১] অতএব তারা কি

---

[১] . শাহাজালাল (র:)এর মাজার- যেখানে চব্বিশ ঘন্টা শির্কের চর্চা হয়। তার এরিয়ার মধ্যে একটি কওমী ও হফেযী মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত শিক্ষা দান করা হয়। অথচ সে মাদ্রাসার ব্যয়ভার পরিচালনা করা হয় মাজারের ইনকাম থেকে!

বরিশাল মহানগরীর কে বি হেমায়েত উদ্দীন রোডের হজরত লেচু শাহ (রঃ)মাদ্রাসাও একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এটি আলিয়া মাদ্রাসা।

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় (৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখে) খবরে প্রকাশঃ "হজরত লেচু শাহ (র:)এর রওজা শরিফ সংলগ্ন ভবনে তারই নামে নগরীর কয়েকেজন সমাজ সেবীর উদ্যোগে এ আলিয়া মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে।.... হজরত লেচু শাহ (র:) রওজা শরিফে সর্বস্তরের মানুষের দানেই প্রতিষ্ঠানটি চলে আসছে।"

কি আশ্চর্য শিক্ষা ব্যবস্থা! শির্ক থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দান? এধরণের মাজার সংলগ্ন ও মাজার কমিটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- মসজিদ-মাদ্রাসা আমাদের দেশে অসংখ্য-অগণিত। সত্য সন্ধানী উৎসুক মানুষ একটু খোঁজ নিলেই আমার একথার সত্যতা জানতে পারবেন।

করে বুঝবে যে, মাজারের ওলীর প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নামে অনুষ্ঠিত এ সমস্ত কার্যাবলী সবই আল্লাহর তাওহীদ বিরোধী শির্কী কর্মকান্ড?

তাওহীদের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে কবর-মাজারের সাথে সম্পর্ক গড়া নয়; বরং তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। ইসলামের আসল শিক্ষা মাজার গড়া নয়; বরং মাজার ভেঙ্গে ফেলা। এই জন্যে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম কবর ও মাজার যিয়ারত নিষিদ্ধ করেন। শুধু তাই নয় মদীনায় হিজরত করে আসার পর সর্বপ্রথম উঁচু কবর ও মাজার ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের উপর ঘর তৈরী করতে ও কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। আবুল হায়্যাজ আল আসাদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) বললেন,

)ألا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ) وفي رواية (وَلا صُورَةً إِلا طَمَسْتَهَا (

আমি কি তোমাকে এমন মিশন দিয়ে পাঠাবো না, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যে মিশন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? আর তা ছিল, কোন মূর্তী পেলে তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে, কোন উঁচু কবর পেলে ভেঙ্গে তা মাটি বরাবর করে দিবে। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ এবং কোন ছবি পেলে তা মিটিয়ে ফেলবে।[১]

একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরকে পাকা করতে ও তা চুনকাম করতে নিষেধ করেছন। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরকে চুনকাম করতে, তার উপর বসতে এবং তা পাকা করতে নিষেধ করেছেন।[২]

---

[১] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরকে ভেঙ্গে মাটি বরাবর করা। হা/১৬০৯।

[২] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরকে পাকা করা ও চুনকাম করা নিষেধ। হা/১৬১০।

কবরস্থান যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেননা কবরের অধিবাসীগণ জীবিতদের দুআর মুখাপেক্ষী। জীবিতরা তাদের মুখাপেক্ষী নয়। এ জন্য তাদের উপকারের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করতে হবে, তাদের নিকট থেকে কোন উপকার পাওয়ার জন্য যিয়ারত করা যাবে না। কবরবাসীর নিকট থেকে উপকার লাভের আশায় যে যিয়ারত করা হয়, তা বিদআতী যিয়ারত। পক্ষান্তরে যে যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে, মৃ তলোকদের উপকার সাধন ও তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ, তবে তা হবে শরীয়ত সম্মত বৈধ যিয়ারত।

কবর যিয়ারতের প্রকারভেদঃ

মানুষ কবরের কাছে যা করে তা দুপ্রকারঃ

প্রথমতঃ শরীয়ত সম্মত। অর্থাৎ শরীয়ত অনুমোদিত নিয়মে কবর যিয়ারত। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করবে না। কবর যিয়ারতের মাধ্যমে সুন্নাতের অনুসরণ, আখেরাতের স্মরণ ও কবর থকে শিক্ষা গ্রহণের নিয়ত করবে।

দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ যিয়ারত। এটা আবার দুপ্রকারঃ

ক) যা হারাম ও শিকের্র পর্যায়ে পৌঁছায়। যেমন, কবর স্পর্শ করা এবং কবরবাসীকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উসীলা বা মাধ্যম সাব্যস্ত করা। কবরের কাছে সালাত আদায় করা, কবরকে আলোকিত করা, কবর পাকা করা এবং কবরের অধিবাসীদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা। যদিও তা ইবাদতের মর্যাদায় না পৌঁছে।

খ) বড় শিরক: যেমন-কবরবাসীর কাছে দুআ করা। তাদের নিকট সাহয্য চাওয়া, তাদের নিকট প্রয়াজন পূরণ পুরণের আশা করা ইত্যাদি। এটা ঠিক তেমন শিরক যা মুর্তি পুজকরা করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে যে কড়াকড়ি আরো তার কারণ কি? কারণ তিনি জানতেন[১] যে কবর-মাজারে সমাধিস্থ লোকদের প্রতি অতিভক্তি শির্কের গোড়া পত্তন করবে। তিনি জানতেন মানুষ কবরের কাছে

[১] . রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা জানেন তা শুধুমাত্র ওহীর ভিত্তিতেই জানতেন। কেননা, নিজের ইচ্ছায় তিনি কোন কথা বলতেন না। আল্লাহ্ বলেন, "তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না, তিনি যা বলেন, তা তো ওহী।" (সূরা নজমঃ ৩-৪)

ঘন ঘন গমণ করলে শয়তান তাদেরকে কবরস্থিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করে শির্কের সূচনা ঘটাবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কবরকে বারবার যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। আরও নিষেধ করেছেন দুআ করার জন্য ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে জমায়েত হওয়াকে অভ্যাসে পরিণিত করতে। এর পরিবর্তে বেশী বোশী দুরুদ ও সালাম পড়তে বলছেন। কারণ তা তাঁর নিকটে পৌঁছে থাকে। অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর এভাবে বারাবার যিয়ারত কারা যদি নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় তবে অন্যান্য কবর ও কথাকথিত মাযারকে কেন্দ্র করে উরূস পালন উৎসব উদ্‌যাপন করা বা মাযারের মৃ তব্যক্তির জন্ম ও মৃ ত্যু বার্ষিকী পালন করার নিষিদ্ধতা আরও ভালভাবে প্রমাণিত হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

)لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ (

তোমাদের গৃহগুলোকে গোরস্থানে পরিণত করো না, (বরং নিজের ঘরে বিভিন্ন সময় নামায আদায় করবে) আমার কবরকে উৎসব স্থলে রূপান্তরিত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর, যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।[১]

বর্তমান যুগে অনেক মানুষ সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর সাথে শির্ক করে থাকে। তারপরও সে নিজেকে পাক্কা ও খাঁটি মুসলমান মনে করে।[২]

---

[১] . [ছহীহ] আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদঃ কবর যিয়ারত, হা/১৭৪৬। দ্রঃ ছহীহুল জামে আলবানী হা/৭২২৬।

[২] . ২০০১ সালে স্বপরিবার হজ্জ করার সময় আরাফাত থেকে ফিরে মুযদালিফায় এসে আমরা যখন মাগরিব ও এশার নামায জামাতের সাথে একত্রে আদায় করে নিদ্রার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন একদল হাজী আমাদের থেকে সামান্য দূরে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে নিদ্রার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে হালকায়ে যিকিরের জন্যে বসে গেল। তাদের ইমাম সুললিত কণ্ঠে বিভিন্ন যিকির পাঠ করছে আর তার সাথে অন্যরাও একই স্বরে তা পাঠ করছে। ঐ সব পাঠ করতে করতে তারা এমন কিছু বলতে লাগল যা শুনে আমার শরীরের লোম যেন খাড়া হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইয়া আবু বকর! ইয়া ওমার! ইয়া উছমান! ইয়া আলী! এবং আরো অনেকের নাম উচ্চারণ করে শেষে বলল ইয়া আবদুল কাদের জীলানী মদদ। অর্থ 'হে আবদুল কাদের জীলানী আমাদেরকে সাহায্য করুন।' আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। আমি উঠে গিয়ে তাদের সামনে দন্ডায়মান হলাম, তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম। ভায়েরা আমার! আপনারা হজ্জ করতে এসেছেন আল্লাহকে ডাকুন! কেন আপনারা আবদুল কাদের জীলানীর কাছে সাহায্য চাইছেন? আমার এই কথা যেন তাদের কর্ণ কুহুরে ঢুকলই না। তারা তাদের যিকির চালিয়ে যেতে থাকল। আমি তখন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম। আমি একটি প্রশ্ন করছি, আপনাদের পালনকর্তা কি

মোটকথা সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগী নিরংকুশ ভাবে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য সমপাদন করাকে **তাওহীদ** বলা হয়। পক্ষান্তরে কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সমপাদন করাটাই শিরক। হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের শিরক থেকে রক্ষা কর। (আমীন)

৩) চরমোনাই পীর থেকে তাওহীদ পুনরুদ্ধারঃ

মৃত্যু বরণ করেছেন? তাই আপনারা চিরঞ্জীব আবদুল কাদের জীলানীর কাছে সাহায্য চাইছেন?! কিন্তু তারা কেউ আমার কথার দিকে কোনই ভ্রুক্ষেপ করল না। তারা তাদের কাজ চালিয়ে গেল।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, হজ্জের মাঠে এসে তারা যদি আবদুল কাদের জীলানীর কাছে সাহায্য চাইতে পারে, তবে তার চাইতে বড় শির্ক আর কী হতে পারে? অথচ তারা মুখে পাঠ করেছেঃ ..লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা..। অর্থাৎ তোমার কোন শরীক নেই, তোমরা দরবারে আমরা হাজির হে আল্লাহ্। লাব্বাইক আহ্বানে তারা কি সত্যবাদী? কখনই নয়। তাদের চেয়ে মক্কার কাফের সম্প্রদায় অধিক সত্যবাদী ছিল। তারাও হজ্জ করত এবং লাব্বাইক্ বলত। কিন্তু তারা যেহেতু শির্ক করত, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে মদদ বা সাহায্য চাইত, তাই তারা বলত: ..লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা ইল্লা শারীকান্ তামলেকুহু ওয়ামা মালাক্..। হে আল্লাহ্ তোমার কোন শরীক নেই, তবে সেই শরীক ব্যতীত তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক তুমি তারও মালিক।

বাংলাদেশে যে সমস্ত পীর সাহেব আছেন তাদের মধ্যে চরমোনাই পীর একজন অন্যতম নামকরা। তার লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও মুরীদান বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেশের বাইরেও তার মুরীদ থাকবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তার মুরীদদের মধ্যে আছেন অসংখ্য আলেম-ওলামা, মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি মানুষকে আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা প্রদান করেন। তার কাছে বাইআত করিয়ে কলব পরিস্কার করার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র সংশোধন করার দাওয়াত দেন। নামাযের পাবন্দ হওয়া, পর্দা রক্ষা করা, সুদ-ঘুষ থেকে বেঁচে থাকা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দেয়া হয়। আর এ জন্যে নির্ধারণ করা আছে দৈনন্দিন ওজীফা। যা সিলেবাস আকারে মুরীদদেরকে জপ করতে হয়। সেই সাথে কসরত করতে হয় নির্দিষ্ট কিছু মুরাকাবার। তাহলেই মুরীদ মারেফতের সিঁড়ি বেয়ে উচ্চস্তরে যেতে পারবেন এবং আল্লাহ্ ওয়ালা হতে পারবেন।

চরমোনাই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ ইছহাক সাহেব। তিনি

মৃত্যু বরণ করলে তার ছেলে সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম খেলাফত লাভ করেন। তিনি পিতার তরীকা অনুসারে মানুষকে মুরীদ করেন। তার মৃত্যুর পর এছহাক সাহেবের আরেক ছেলে সৈয়দ রেজাউল করীম এখন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়দ এছহাক সাহেব মানুষকে সহজে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্যে ছোট-বড় ২৭খানা কেতাব রচনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ২৭ *খানা কেতাব বাংলা ভাষায় লিখিয়া দিলাম। ইহা পাঠ করিয়া আমল করুন, আপন বাড়ী বেহেশতে চলুন।* (ভেদে মারেফতঃ ৯৪ পৃষ্ঠা)

ঐ সমস্ত গ্রন্থ সবগুলোই আমার সংগ্রহ করা ও পাঠ করা সম্ভব হয়নি। ৩/৪টি বই আমার হাতে পড়েছে। তা পাঠ করে আমার কাছে মনে হয়েছে, পীরদের হাতে যারা বায়আত করেনি বিশ্বের এরকম কোটি কোটি মুসলমান জাহান্নামের পথে এগুচ্ছেন। আর তারা এবং তাদের মত অন্য হক্কানী (?) পীর ও তাদের খাঁটি মুরীদরা নিজেদের তৈরী জান্নাতের পথে এগুচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে ঐ বই সমূহ পাঠ করে, তার মধ্যে যা আছে তার প্রতি বিশ্বাস রেখে, সে অনুযায়ী আমল করে একজন মুসলমান কোন পথে এগুবেন তার জন্যে চিন্তাশীল, সুস্থ বিবেক সম্পন্ন এবং কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের সামান্য জ্ঞানের অধিকারী পাঠকের সামনে কিছু কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। অতঃপর কুরআন ও ছহীহ্ সুন্নাহর আলোকে তার বিশ্লেষণ করে সত্যাসত্যের বিচার পাঠকের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

নিম্নে মুহতারাম পীর সাহেবের মাত্র দুটি বই (১) ৩**ভেদে মারেফত বা ইয়াদে খোদা**[১] এবং (২)৩**আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী**[২] থেকে সারসংক্ষেপ কিছু উক্তি উল্লেখ করব। তারপর তার বিশ্লেষণ করব। ইনশাআল্লাহ্।

১) পরকালে মুক্তির জন্যে কি পীর ধরা আবশ্যক?

---

[১] . প্রকাশকঃ মুহাম্মদ তারিক আজাদ চৌধুরী, আল এছহাক প্রকাশনী, ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০ ফোনঃ ৭১২৩৫২৬। সংশোধিত সংস্করণঃ নভেম্বর, ২০০৫ ইং।

[২] . প্রকাশক ও প্রকাশের সনঃ ঐ

পীর সাহেব লিখেছেনঃ *সত্যই কেয়ামতের অবস্থা এইরূপ (ভয়ানক) হইবে এবং আল্লাহর হুকুমে সেই দিন নিঃসন্দেহে পীরগণ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়।* (ভেদে মারেফতঃ ২৫-২৬)

পীর সাহেব আরো লিখেছেনঃ *কামেল পীর হইলেন আখেরাতের উকীল স্বরূপ।"* (ভেদে মারেফতঃ ৬১ পৃ ঃ)

পীর সাহেব আরো লিখেছেনঃ *হযরত থানবী লিখিয়াছেন, জনৈক দরবেশ সাহেবের মৃত্যুর পর এক কাফন চোর কবর খুড়িয়া (দরবেশের) কাফন খুলিতে লাগিল। দরবেশ সাহেব চোরের হাত ধরিয়া বসিলেন। তা দেখে চোর ভয়ের চোটে চিৎকার মারিয়া বেহুঁশ হইয়া মরিয়া গেল। দরবেশ স্বপ্নযোগে তার এক খলীফাকে আদেশ করিলেন চোরকে তার পার্শ্বে দাফন করিতে। খলীফা এতে আপত্তি করিলে দরবেশ বলিলেনঃ* ***কাফন চোরের হাত আমার হাতের সঙ্গে লাগিয়াছে, এখন কেয়ামত দিবসে ওকে ছাড়িয়া আমি কেমনে পুলছেরাত পার হইয়া যাইব?*** (ভেদে মারেফতঃ ২৭-২৮ পৃ ঃ)

তিনি আরো লিখেছেনঃ *কেয়ামতের সেই মহাবিপদের সময় হক্কানী পীর সাহেবগণ আপন মুরীদগণকে হযরত নবী করীম (সঃ) এর কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন। এবং হুজুরে আকরাম (সাঃ) তাহাদিগকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাইবেন।* (আশেক মাশুক পৃ ঃ৬৬)

তিনি আরো লিখেছেনঃ *এরূপভাবে পরকালেও তাঁহাদের (ওলীদের) ক্ষমতার সীমা থাকিবে না। হাশরের মাঠে একজন আওলিয়ায়ে কেরামের উছিলায় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের হাজার গুনাহগার উম্মতকে আল্লাহ্ পাক মাফ করিয়া দিবেন।* (আশেক মাশুক পৃ ঃ৮১)

পর্যালোচনাঃ

আখেরাতের মুক্তি আসল মুক্তিঃ

সম্মানিত পাঠক! পূর্বের কথাগুলো আপনাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। কঠিন হাশরের দিনে পীর-দরবেশগণ তাদের মুরীদদের সাহায্য করবেন, তাদের পক্ষে ওকালতী করবেন, তাদের গুনাহ্ মাফ করিয়ে দিবেন, তাদের নিয়ে পুলসিরাত পার হবেন, তাদেরকে হাওযে কাউছারের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন।

অতএব মুরীদদের আর কোন চিন্তা নাই। সব সমস্যার সমাধান তো তারা করেই দিলেন। কারণ আখেরাতের সমস্যাই তো বড় সমস্যা। আখেরাতের বিপদই তো বড় বিপদ। মুমিনের জন্যে আখেরাতের জীবনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার কাঙ্খিত কামনা হচ্ছে জান্নাত লাভ। তাই যখন কিনা পীরদের কাছে বায়আত করলে, তাদের পাগড়ি ধরলে তাদের কথা মত যিকির-ফিকির ও ওযীফার আমল করলে এই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে তখন আর চিন্তা কিসের? এই জন্যেই মনে হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের হাতে মুরীদ হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করেন এবং তাদের সাহায্য ও শুপারিশ লাভের আশায় তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। নানান রকমের হাদিয়া, নযরানা, মানত ইত্যাদি পেশ করে তাদের মন তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। কেননা পীর সাহেব অসন্তুষ্ট হলে বিপদ। তিনি তখন আর ওকালতি করবেন না। অতএব যাবতীয় কাকুতি-মিনতী তাঁর কাছে নিবেদন করা ছাড়া উপায় নাই।

যখন কিনা এই পীর সাহেবগণ কঠিন আখেরাতের মাঠে মহা প্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে মুরীদদের উপকার করতে পারবেন, আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, তখন দুনিয়ার জীবনে মুরীদদের সাহায্য করা তো খুবই সামান্য ও সাধারণ ব্যাপার! অতএব বিপদ উদ্ধার, রোগ মুক্তি, মামলায় জেতা, শত্রুকে পরাজিত করা, গযব-আযাব থেকে রক্ষা, গুনাহ মাফ, সন্তান লাভ, জিন-ভুতের উপদ্রব থেকে বাঁচা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে তাদের কাছে না যাওয়া ও তাদেরকে আহ্বান না করার তো প্রশ্নই উঠে না। এই কারণেই মনে হয় মানুষ উক্ত উদ্দেশ্যে অহর্নিশ তাদের দরবারে ছুটে চলেছেন। তারা যে ঐ সমস্ত কাজেরও দায়িত্ব পালনের দাবী করে থাকেন তার বিবরণ কিছুক্ষণ পরে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

জনাব পীর সাহেবদের প্রতি আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একবারও কি আপনারা চিন্তা করেছেন আপনাদেরকে সেই কঠিন হাশরের দিনে কে সাহায্য করবে? কে আপনাদের জন্যে সুপারিশ করবে? কে আপনাদেরকে পুলসিরাত পার করাবে? কে আপনাদের গুনাহ মাফ

করিয়ে দিবে? নাকি আপনারা আল্লাহর নিকট থেকে অগ্রিম ছাড়পত্র পেয়ে গেছেন যে আপনাদের কোন গুনাহ্ হবে না? আপনারা নবী-রাসূলদের মত নিষ্পাপ? নাকি এমন কোন গ্যারান্টিবার্তা পেয়ে গেছেন বা আপনাদের কাছে ওহী হয়েছে যে হাশরের মাঠে আপনাদের কোন সাহায্যের দরকার পড়বে না- আপনারা বিনা হিসেবে মুক্তি পেয়ে যাবেন? আপনারা কি নিশ্চিতভাবে জান্নাতের টিকেট খরীদ করে নিয়েছেন? কে বিক্রি করল আপনাদের কাছে জান্নাতের টিকেট? কোথায় পেলেন এই ক্ষমতা? আল্লাহ্ কি আপনাদেরকে তাঁর ক্ষমতার অংশ বিশেষ দান করে আরাম করছেন? (নাউযুবিল্লাহ্) আপনারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছেন? কে আপনাদেরকে নিরাপত্তা বার্তা পৌঁছালো? আল্লাহ্ কি বলেন নি?

﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾

অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র করো না। তিনিই বেশী জানেন কে বেশী আল্লাহকে ভয় করে।" (সূরা নাজমঃ ৩২)

প্রিয় পাঠক! জনাব পীর সাহেবসহ তার মুরীদান ও সমগ্র মুসলমান জাতিকে নিম্নের আয়াত সমূহ ও হাদীছগুলো গভীরভাবে অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানাচ্ছিঃ

কিয়ামতের দিন তাওহীদ ছাড়া উপায় নাইঃ

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে, তাঁর তাওহীদকে বাস্তবায়ন করে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না, আখেরাতকে বিশ্বাস করে, সে দিন হিসাবের সম্মুখিন হওয়ার ভয় করে তাদেরকে আহ্বান করে এরশাদ করেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছে তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ কর সেই দিন আসার পূর্বে যখন না আছে বেচা-কেনা, না আছে বন্ধুত্ব আর না আছে কোন সুপারিশ।। (সূরা বাকারাঃ ২৫৪)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾

হে মুহাম্মাদ (সাঃ) আপনি এই কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন যারা তাদের পালনকর্তার কাছে একত্রিত হওয়াকে ভয় করে, সেদিন তিনি (আল্লাহ্) ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু থাকবে না এবং কোন সুপারিশকারী হবে না। (সূরা আনআমঃ ৫১) ইমাম ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেনঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন তবে তা থেকে রক্ষা করার জন্যে কোন বন্ধু, কোন আত্মীয়, কোন সুপারিশকারী থাকবে না। (তাফসীর ইবনে কাছীরঃ ৩/২৫৯)

যারা তাওহীদপন্থী প্রকৃত ঈমানদার তাদের একটা পরিচয় আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা কিয়ামত দিবসে কঠিন হিসাবের সম্মুখিন হওয়ার আশংকা করে। (সূরা রাদঃ ২১)

এই পীর সাহেবগণ কি কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় করেন না? তারা কি আল্লাহর হিসাবের সম্মুখিন হওয়ার ব্যাপারে শংকামুক্ত ও নিরাপদ হয়ে গেছেন? তারা নিজেরাই

যদি হিসাবের সম্মুখিন হন তবে অন্যের ওকালতী করবেন কিভাবে? আল্লাহ্ বলেন,

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾

ওরা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্থ জাতি ছাড়া কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না।" (সূরা আরাফঃ ৯৯)

আয়াতুল কুরসীর মধ্যে আল্লাহ্ বলেনঃ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ কে সেই এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীরেকে কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে? (সূরা বাকারাঃ ২৫৫)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে না।" (সূরা ইউনুসঃ ৩)

মুরীদদের সাহায্য বা সুপারিশ করার জন্যে পীর সাহেবগণ কি দুনিয়াতেই আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছেন? কোথায় সেই অনুমতি পত্র, দয়া করে তারা দেখাবেন কি?

আল্লাহ্ ব্যতীত সুপারিশের কেউ মালিক নয়, অধিকারী নয়, অতএব তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ

সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না। কেউ যদি আল্লাহর অনুমতি না পেয়েই নিশ্চিতভাবে আখেরাতে সুপারিশ করতে পারবে এমন দাবী দুনিয়াতে করে বসে, তবে সে যে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে নিল এবং মুশিরক হয়ে গেল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন! তাদের কোন কিছুতে মালিকানা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও (সুপারিশ করতে পারবে)? বলে দিন, যাবতীয় সুপারিশ আল্লাহরই আয়ত্বাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা যুমারঃ ৪৩-৪৪)

হাশরের মাঠে নবী-রাসূলদের পেরেশানীঃ

কঠিন হাশরের দিন পীর সাহেবগণ মুরীদদের পক্ষে ওকালতী করবেন তো দূরের কথা সেদিন তো নিষ্পাপ নবী-রাসূলগণই হয়রান পেরেশান থাকবেন।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, হাশরের মাঠে মানুষ যখন বিপদে পড়ে যাবে এবং অসহনীয় আযাবে গ্রেপ্তার হবে, তখন তারা একজন সুপারিশকারী খুঁজে ফিরবে। যাতে করে তারা এই ভীষণ সংকট থেকে রেহাই পেতে পারে। প্রথমে তারা আদম (আঃ)এর কাছে গমণ করবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ)এর কাছে যাবে। তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। প্রত্যেক নবী নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন। অবশেষে তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে আসবে। তিনি মানুষকে এই বিপদজনক অবস্থা হতে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর আরশের নীচে সিজদাবনত হবেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে মাথা উঠিয়ে প্রার্থনা করার অনুমতি দিবেন। তিনি তখন সমগ্র মানুষের হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাঁর দুআ এবং শাফাআত

কবুল করবেন। এটিই হল ওমাক্বামে মাহমূদ বা সুমহান মর্যাদা, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন।[১]

শাফাআতের শর্তঃ

সহীহ্ হাদীছ মোতাবেক সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর অনুমতি পেয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুপারিশ করবেন। অন্যান্য নবী-রাসূল, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ সুপারিশ করবেন।

কিন্তু এই প্রকার শাফায়াতের জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে। যথাঃ

১- শাফায়াতকারীর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

২- যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার উপরও আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা। আর তাওহীদ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর তরীকায় প্রতিষ্ঠিত থাকা ব্যতীত করো উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন না।

---

[১] . এসম্পর্কে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ সহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ তাওহীদ, অনুচ্ছেদঃ কিয়ামতের দিন নবী-রাসূল ও অন্যদের সাথে আল্লাহর কথা বলার বিবরণ, হা/৬৯৫৬। সহীহ্ মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি হা/ ২৮৬।

৩- শাফায়াতকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি থাকা।

প্রথম শর্তের দলীলঃ আল্লাহ্ পাক বলেন, يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন (কিয়ামতের দিন) কোন উপকারে আসবে না। (সূরা ত্বাহাঃ ১০৯)

দ্বিতীয় শর্তের দলীলঃ আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

আকাশে অনেক ফেরেশতা আছে। তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (সূরা নাজমঃ ২৬)

সুবহানাল্লাহ্! ফেরেশতাদের সুপারিশও আল্লাহর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীরেকে ফলপ্রসূ হবে না? অথচ ফেরেশতারা তো নিষ্পাপ। অবশ্য হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে যে ফেরেশতারাও মুমিন বান্দাদের জন্যে সুপারিশ করবেন। কিন্তু তা হবে আল্লাহর

নিকট থেকে অনুমতি পাওয়ার পরই। পীর সাহেবগণ কি ফেরেশতাদের চেয়েও আল্লাহর নিকট পবিত্র ও সম্মানিত? যার কারণে তারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে, *সেই দিন নিঃসন্দেহে পীরগণ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়!?*

আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট সে ছাড়া কারো জন্য সুপারিশ করা হবে না। (সূরা আম্বিয়াঃ ২৮) তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾

যার জন্যে অনুমতি দেয়া হবে সে ছাড়া তাঁর নিকট কারো জন্যে সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবাঃ ২৩) অর্থাৎ মুমিন ছাড়া কারো জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। কিন্তু যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা কারো সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাই তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করারও কোন অনুমতি দেয়া হবে না।

তৃতীয় শর্তের দলীলঃ

আল্লাহ্ বলেনঃ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ কে সেই এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি

ব্যতীরেকে কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে? (সূরা বাকারাঃ ২৫৫)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে না।" (সূরা ইউনুসঃ ৩)

যদি ধরে নেয়া যায় যে, পীরদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। (যদিও তা সুদূর পরাহত) কিন্তু পীর সাহেবরা কি করে জানলেন যে তাদের মুরীদদের উপরও আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন ফলে তাদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন? যার কারণে তারা মুরীদদেরকে *কামেল পীর হইলেন আখেরাতের উকীল স্বরূপ।"* অথবা *সেই দিন নিঃসন্দেহে পীরগণ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়।"* ইত্যাদি কথা বলে তাদের কাছ থেকে বায়আত নিয়ে থাকেন? (হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে ঈমান ব্যবসায়ীদের কবল থেকে রক্ষা কর)

মক্কার কাফের-মুশরিকরা মুর্তিদের নিকট থেকে এই সাহায্য বা সুপারিশ পাওয়া ব্যতীত অন্য কোন আশা করেছিল কি? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ তারা বলে, এরা (মুর্তিগুলো) আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।‌ (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

অতএব যে সমস্ত মুসলমান অজ্ঞতা বশতঃ এ সমস্ত পীরের ধোকাপূর্ণ কথা বিশ্বাস করে তাদের হাতে বায়আত করে তাদের কাছ থেকে সাহায্য বা শাফাআতের আশা করেছেন তাদেরকে বলতে চাই এই শাফাআত তাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের উপকারে আসবে না।‌ (সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ৪৮) কারণ আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের শির্কের উপরে সন্তুষ্ট নন। তাদেরকে শাফায়াতের অনুমতি দেয়াও সম্ভব নয়। আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট হবেন, কেবল তার জন্যই সুপারিশ বৈধ হবে।

তাওহীদ না থাকলে শাফাআত পাওয়া যাবে নাঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, এ সকল মুশরিকদের অন্তরে যে বিষয়টি বদ্ধমূল আছে তা হচ্ছে, তাদের ওলীগণ তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য-সুপারিশ করবেন। এই বিশ্বাসটাই হচ্ছে আসল শির্ক। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কিতাবে এবিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করেছেন, বলেছেন পরকালে সাহায্য-সুপারিশের পুরা বিষয়টাই তাঁর অধিনে। তাঁর অনুমতি না পেয়ে কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে না। যার কথা ও কাজে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তার পক্ষেই সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। আর তারা হচ্ছে ঐ সকল মানুষ যারা তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছে এবং যারা আল্লাহ্ ছাড়া কোন পীর-ওলীকে সাহায্য বা সুপারিশকারী গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ যাকে চাইবেন তাদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। তখন তারা হবে সুপারিশ লাভে সর্বাধিক ধন্য মানুষ।[১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) আরো বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ)এর প্রশ্নের জবাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর এই বাণীটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, হে

---

[১] . মাদারেজুস্ সালেকীন ১ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা

আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত দিবসে আপনার শাফায়াত লাভে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান মানুষ কে হবে? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরেলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করবে।' (সহীহ বুখারী) লক্ষ্য করুন! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিভাবে খালেস তাওহীদকে তাঁর শাফায়াত পাওয়ার বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ মুশরেকরা ধারণা করে যে, মানুষকে ওলী বা মাধ্যম হিসেবে মানলে তাদের নিকট থেকে সুপারিশ বা সাহায্য পাওয়া যাবে। ওলী-আউলিয়াদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তারা ওকালতি করে তাদেরকে পার করে দিবেন। যে মানুষ খালেসভাবে কালেমা পাঠ করেছে সে কখনোই তার মত আরেক মানুষকে মধ্যস্থ ধারণা করতে পারে না। কারণ আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য কাউকে মধ্যস্থ ধরাটাই হচ্ছে আসল শির্ক। যে শির্কে লিপ্ত ছিল মক্কার আবু জাহেল-আবু লাহাব সমপ্রদায়। ওরা তো শুধু মুর্তিগুলোর নিকট থেকে এই শাফাআত পাওয়ারই আশা করেছিল। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ তারা বলে, এরা আমাদের জন্য

আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।' (সূরা ইউনুসঃ ১৮)[১] অতএব কিভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শির্ককারীদের জন্যে সুপারিশ করবেন? তিনি বলেন,

'আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে জনৈক ফেরেশতা আগমণ করে আমাকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি কিয়ামত দিবসে গ্রহণ করার জন্য স্বাধীনতা দেন। একটি হচ্ছে আমার উম্মতের অর্ধেক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কিয়ামত দিবসে আমি তাদের জন্যে শাফাআত করব। আমি সুপারিশের বিষয়টিকে গ্রহণ করি। আমার শাফাআত ঐ লোকদের জন্যে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে (তথা তাওহীদ নিয়ে) মৃত্যু বরণ করেছে।'[২]

শাফাআত শুধু আল্লাহর কাছে চাইতে হবেঃ

---

[১] . মক্কার কাফেরদের তাওহীদ ও শির্কের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

[২] . আওফ বিন মালেক আশজাঈ (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী 'শাফাআত' অনুচ্ছেদে হাদীছটি বর্ণনা করেন। হা/২৩৬৫। ইবনে মাজাহ্ হা/৪৩০১ ও ৪৩০৮।

সকল শাফাআতের মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা, যেহেতু তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ শাফাআত করতে পারবে না, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা অন্য কেউ কারো জন্য শাফাআত করবেন না যে পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্ অনুমতি না দিবেন, যেহেতু তাওহীদ পন্থী ছাড়া আল্লাহ্ কারো জন্য অনুমতি দিবেন না, যেহেতু শির্ক করলে শাফাআত থেকে বঞ্চিত হতে হবে, যেহেতু প্রমাণিত হল যে সব শাফাআত একমাত্র আল্লাহর- সেহেতু আমরা এই শাফাআত একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইছি। কোন নবীর কাছে নয়; কোন ওলী বা দরবেশ বা পীরের কাছে নয়।

পীরের মুরীদ হলেই যদি আখেরাতে পার পাওয়া যায়, তবে পীরের আত্মীয় হলে তো কোন কথাই নেই। সে তো জান্নাতে চলেই গেছে। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে এরকম কোন দায়িত্ব নেননি বা তাদেরকে পার করে দেয়ার আশ্বাসও দেননি।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ যখন নাযিল করলেনঃ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ এবং আপনার বংশের নিকটাত্মীয়দেরকে জাহান্নামের ভয় দেখান।" (সূরা শুআরাঃ ২১৪) তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ বংশ কুরায়শ এবং কুরায়শের অন্যান্য গোত্রকে একত্রিত করলেন এবং বললেনঃ

)يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا(

হে কুরায়শ সমপ্রদায় তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর, আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের কোন কাজে আসব না। হে আবদে মানাফ গোত্র! আল্লাহর পাকড়াও থেকে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর পাকড়াও থেকে আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে ছাফিয়া! রাসূলুল্লাহর ফুফু, আল্লাহর

পাকড়াও থেকে রক্ষা করার জন্যে আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! আমার নিকট দুনিয়ার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্যে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[১]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতেন যে তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতিতে মুমিনদের জন্যে সুপারিশ করবেন, সুপারিশ করবেন কাবীরা গুনাহে লিপ্ত লোকদের জন্যেও। তারপরও তিনি নিকটাত্মীয় হওয়ার সূত্রে এই লোকগুলোর জন্যে কোন ধরণের সাহায্য করার বিষয়কে নাকচ করে দিলেন। যারা মুশরিক তাদের কথা বাদ দিলে তো অন্য যারা ঈমানদার ছিলেন, তাদের বিষয়টি তো নাকচ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু যেহেতু তিনি নির্দিষ্টভাবে ব্যক্তি বিশেষের জন্যে সুপারিশ করার বিষয়ে কোন ক্ষমতা রাখেন না, তাই তিনি তা নাকচ করে দিয়েছেন। যাতে করে আত্মীয় হওয়ার দাবীতে

[১] . নাসাঈ, অনুচ্ছেদঃ ওসীয়ত, হা/ ৩৫৮৬ [দ্রঃ সহীহ্ নাসাঈ আলবানী হা/৩৬৪৬, ও সহীহ্ মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ এর ব্যাখ্যা, হা/ ৩০৫।

কেউ এই আশা রাখতে না পারে যে আমরা নবীজীর মাধ্যমে পার পেয়ে যাব। আল্লাহ্ অনুমতি না দিলে এবং শাফাআতকৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট না হলে নবীজী তার জন্যে কখনই সুপারিশ করবেন না। অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সবচেয়ে নিকটবর্তী লোকদের যখন এই অবস্থা তখন অন্যদের অবস্থা কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এই আলোচনার পরও যদি কোন মানুষ দাবী করে যে, সে কিয়ামতে আল্লাহর কাছে কারো জন্যে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে, তবে সে যে নিজেকে আল্লাহর সমক্ষ নির্ধারণ করে মুশরিক হয়ে গেল একথা সূর্যের মত স্পষ্ট। অনুরূপভাবে একথাও প্রকাশ হয়ে গেল যে, কেউ যদি বিশ্বাস করে নির্দিষ্টভাবে উমুক ব্যক্তি তার এবং আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি তার জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন সেও কাফের মুশরিক। যদিও সে কালেমাওলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে, নামায পড়ে, যাকাত দেয়, রোযা রাখে, হজ্জ-ওমরা করে

এবং দাবী করে যে আমি মুসলিম। এর সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব, কাদের যাবতীয় আমল বরবাদ? তারা হচ্ছে সেই লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্মপ্রচেষ্টা গুমরাহীর পথে পরিচালিত হয়েছে; অথচ তারা মনে করে যে তারা নেক আমল করছে। (সূরা কাহ্ফঃ ১০৩-১০৪)

পুলসিরাত পার হতে পীর নয় তাওহীদ দরকারঃ

একমাত্র তাওহীদ ও নেক আমলই মানুষকে পুলসিরাত পার করিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। পীরের হাতে হাত রাখলে জান্নাত পাওয়া যাবে একথা কুরআন-সুন্নাতের কোথাও নেই।

পুলসিরাত পার হওয়ার সময় মুমিনদেরকে তাদের ঈমান ও আমল অনুসারে আলো দেয়া হবে। যার

আমল সবচেয়ে বেশী হবে তার আলো হবে পাহাড়ের মত বিশাল। আর যার আমল সবচেয়ে কম হবে তার আলো হবে অতি ক্ষুদ্র, যা তার পায়ের বৃ দ্ধাঙ্গুলেরএক পাশে থাকবে। ঐ আলোকরশ্মিতে তারা পুলসিরাত পার হবে। মুমিন ব্যক্তি কেউ চোখের পলকে কেউ বিদ্যুতের বেগে, কেউ ঝড়ের বেগে, কেউ পাখির মত, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত এবং কেউ সাধারণ আরোহীর মত পুলসিরাত অতিক্রম করবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাপদে পার হবে, কারো শরীরের গোস্ত ছিঁড়ে যাবে, কেউ আবার জাহান্নামে পড়ে [illegible] (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু মুনাফেকরা কোন আলো পাবে না। তারা মুমিনদের কাছে আলো ভিক্ষা চাইবে। তাদেরকে বলা হবে পিছনে ফিরে গিয়ে আলো অনুসন্ধান করো। আলোর খোঁজে ফিরে গেলে তাদের মাঝে এবং মুমিনদের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া করে দেয়া হবে। (সূরা হাদীদঃ ১৩) তারপরও তারা পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা

হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ওরা হচ্ছে এমন লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, কারো কাছে ঝাড়-ফুঁক চায় না, পাখি উড়িয়ে ভাল-মন্দ নির্ধারণ করে না। তারা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করে।[1]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হল সুপথ প্রাপ্ত। (সূরা আনআম: ৮২)

অর্থাৎ যারা ঈমান আনার পর একনিষ্ঠ থেকেছে, খালেসভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছে এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করেনি তারা কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে সুপথ প্রাপ্ত।[2]

---

[1] . বুখারী, অনুচ্ছেদঃ যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, হা/ ৫৩১১, ৬০৫৯ ও মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক বিনা হিসাবে বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন তার দলীল, হা/ ৩২০, ৩২৩।

[2] . তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/২৯৪ পৃঃ, সূরা আনআমের ৮২ নং আয়াতের তাফসীর।

উবাদাহ বিন সামেত (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ)

যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই তিনি এক তার কোন শরীক নেই। (আরো সাক্ষ্য দেয় যে) মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল আর ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারয়ামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন ও তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ এবং (আরো সাক্ষ্য দেয় যে) জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। তাহলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সে যে কোন আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক না কেন।[১]

[১] . বুখারী, অধ্যায়ঃ নবীদের হাদীছ, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ يأأهل الكتاب... হা/৩১৮০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তির তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার দলীল। হা/৪১।

ঈতবান বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ] বলবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।[১]

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে উহা পাঠ করবে, সে কখনই তাঁর সাথে শির্কে লিপ্ত হতে পারে না। কখনই তাঁকে বাদ দিয়ে পীর-ফকীর-মাজারে ধর্ণা দিতে পারে না। অথবা তাঁকে পাওয়ার জন্যে তার মতই আরেক মানুষকে উসীলা বা মাধ্যম মানতে পারে না। (উসীলা সম্পর্কে অচিরেই বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ্)

---

[১] . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ গৃহে মসজিদ... হা/৩১৮০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ বিনা ওযরে জামাতের নামাযে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি। হা/১০৫২।

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন,

(وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً)

যে ব্যক্তি পৃ থিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে আসবে এ অবস্থায় যে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তবে অনু্রূপ (পৃ থিবীপূর্ণ) মাগফিরাত নিয়ে আমি তার সাথে সাক্ষাত করব।[১]

মুআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মুআয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর দাবী কি? আর আল্লাহর উপর বান্দার দাবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১] মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দু'আ, তওবা ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ যিকির, দু'আ, তওবা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ফযীলত। হা/৪৮৫২।

সাল্লাম) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর দাবী হচ্ছে তারা এককভাবে তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার দাবী হচ্ছে, যে বান্দা শির্ক মুক্ত ইবাদত করবে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

এই অর্থবোধক আরো অসংখ্য আয়াত ও হাদীছ রয়েছে। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, শির্ক মুক্ত খাঁটি ঈমান এবং সুন্নাত মোতাবেক নেক আমলই মানুষকে নিরাপদে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিতে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে সহযোগিতা করবে । জীবিত বা মৃত পীরের হাতে হাত লাগলে বা তার কাছে বায়আত করলে এরকম কোন নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না; বরং তাদের প্রতি ঐরূপ বিশ্বাস রাখলে মুশরেক হয়ে মরতে হবে এবং আখেরাতের নিরাপত্তা হারাতে হবে। কারণ পীরেরা নিজেরাই জানেন না তারা নিরাপদে পুলসিরাত পার হতে পারবেন কি না, অন্যকে পার করা তো দূরের কথা। অন্যকে মুক্তি করিয়ে দেয়া তো দূরের কথা তারা নিজেরাই জানেন না আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্তি দিবেন কি না! *যে নিজেই ভিক্ষুক সে অন্যকে ভিক্ষা দিবে কিভাবে?*

২) মৃত্যুর সময় পীর কি শয়তান থেকে বাঁচাবে?

চরমোনাই পীর মাওলানা এছহাক সাহেব লিখেছেনঃ *মৃত্যুর সময় যখন শয়তান ঈমান লুটিবার জন্য আসিবে, তখন পীর ছাড়া উপাই নাই.....।*[১] (ভেদে মা'রেফত ৩২ পৃ ঃ)

---

[১] . এখানে পীর সাহেব একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেনঃ "ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী একজন কামেল পীরের কাছে মুরীদ হতে চাইলেন। পীরের দরবারে উপস্থিত হলে পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, আপনার মধ্যে এত এলেম যে এলমে মারেফত ঢুকিবার জায়গা নাই। কাজেই আপনাকে মুরীদ করিতে আমি অক্ষম। ইমাম সাহেব বলিলেন, হুজুর তবে আমার উপাই কি? হুজুর বলিলেন, "বাবা এক কাজ করুন, এক বৎসর যাবৎ কিতাব দেখা বন্ধ করিয়া দেন, তাহাতে যতটুকু জায়গা খালি হইবে, ঐখানে কিছু এলমে মা'রেফত রাখিতে চেষ্টা করিব।" অতঃপর ইমাম সাহেব জঙ্গলে গিয়ে এক বছর যাবত কোন কিতাব না দেখে একটি তাফসীরের কিতাব রচনা করিলেন। এক বছর শেষে হুজুরের কাছে ফেরত এলে হুজুর বলিলেন, আপনি এতবড় কিতাব না দেখিয়া লিখিয়াছেন ইহাতে আপনার এলেম আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আপনাকে আমি মুরীদ করিতে পারিব না, আপনাকে আমি দু'আ করিব।" ইমাম সাহেব দুঃখিত মন নিয়ে রাওয়ানা করিলেন এবং চিন্তা করিলেন যে, মৃত্যুর সময় যখন শয়তান ঈমান লুটিবার জন্য আসিবে, তখন পীর ছাড়া উপাই নাই, পীর সাহেব তো আমাকে মুরীদ করিলেন না- এখন আমার উপায় কি?... এরপর ইমাম সাহেব শয়তানকে পরাজিত করার জন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে এক হাজার দলীল উপস্থাপন করিলেন। কিন্তু শয়তানের সাথে তর্ক করে তার সকল দলীল শেষ হইয়া গেল। এবার ইমাম সাহেব বিপদে পড়িয়া গেলেন এবং তার ঈমান হারানোর সম্ভাবনা দেখা দিল। এমন সময় ঐ পীর সাহেব বদনা হাতে নিয়ে ওজু করিতেছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের এই ভয়ানক অবস্থা দেখিতে পাইলেন। অতঃপর পীর সাহেব ইমাম সাহেবের বাড়ীর দিকে কিছু পানি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তুমি শয়তানকে বলিয়া দাও, বিনা

তিনি আরো লিখেছেনঃ *পীর যদি সনদ বিহীন বা বেদআতী হয়, তবে সে মৃ ত্যুর সময় কোন কাজে আসিবে না।* (ভেদে মা'রেফতঃ ৬২ পৃ ঃ)

শয়তান মানব জাতির বড় শত্রুঃ

শয়তান মানব জাতির সবচেয়ে বড় ও প্রকাশ্য শত্রু। আদম সৃ ষ্টিরসূচনা লগ্ন থেকে তার সাথে মানব জাতির শত্রুতার উৎপত্তি। আদমকে সিজদা না করার অপরাধে সে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু সে আল্লাহর কাছে আবেদন করে যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে যেন হায়াত দেয়া হয়; সে তার সকল

দলীলে আল্লাহ্ পাক এক, তিনি এক হইবার জন্যে কোন দলীলের দরকার হয় না। কয়েক মাসের রাস্তা দূর হইতে আল্লাহ্ পাকের রহমতে ঐ আওয়াজ ইমাম সাহেবের কর্ণে পৌঁছিবা মাত্র ইমাম সাহেব বলিলেন, শয়তান এখান থেকে ভাগ এবং জানিয়া রাখ, বিনা দলীলে আল্লাহ্ এক। শয়তান এই কথা শুনিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেল, তোমার ভাগ্য ভাল যে, একদিন কামেল পীরের দু'আ নিয়াছিলা, নচেৎ তোমাকে বেঈমান করে আমার সঙ্গে জাহান্নামে নিয়া যাইতাম।" (ভেদে মারেফতঃ ৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

সুবিজ্ঞ পাঠক! এই ঘটনা পড়ে যা বুঝা যায় তা হচ্ছেঃ (১) মারেফত পেতে হলে শরীয়তের জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকতে হবে। (২) শরীয়তের এলেম থাকলে সেখানে মারেফতের এলেম ঢুকবে না। অন্য কথায় মূর্খতা হচ্ছে এলমে মারেফতের বড় বন্ধু। (৩) মৃত্যুর সময় পীর সাহেব ঈমান বাঁচানোর জন্যে মুরীদদের কাছে হাযির হবেন। (৪) মুরীদ যেখানেই থাক, তাকে তার পীর দেখতে পান এবং তাকে সাহায্য করতে পারেন। (৫) যারা পীরের কাছে মুরীদ হয়নি বা তার দু'আ নেয়নি, তাদের বেঈমান হয়ে জাহান্নামে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। (নাউযুবিল্লাহ্)

প্রচেষ্টা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করবে আদমের সন্তানদের বিভ্রান্ত করার জন্যে। কুফরী ও শির্কে লিপ্ত করে তাদেরকে জাহান্নামে তার সাথী বানানোর জন্যে। তার কথা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً، قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا﴾ .

শয়তান বলল, আপনি কী মনে করেন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, যদি ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত আপনি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে তার বংশধরদের মধ্যে থেকে অল্প কয়জন ছাড়া সকলকে সমূলে আমি বিনষ্ট (বিভ্রান্ত) করে ফেলব। আল্লাহ্ বললেন, ঠিক আছে যাও, তোমার এবং তোমার যারা অনুসরণ করবে সকলের জন্য পরিপূর্ণ শাস্তি হল জাহান্নাম। তাদের মধ্যে যাকে পার তোমার আহ্বান দ্বারা পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে (কুফরী, শির্ক, বিভ্রান্তি ও অন্যায়ের পথে ধাবিত

করার জন্য) আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও।[১] আর তাদেরকে (যা ইচ্ছা) প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা শুধু ধোকা ও ছলনা।” (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৬২-৬৪)

এই শত্রু এবং তার চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের জন্য অনেকটা অসাধ্য। এর অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তিনি ছাড়া পৃথিবীর কোন শক্তি শয়তান থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না। তিনিই শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানেন কিভাবে একে প্রতিহত করতে হয়।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, মানুষরূপী শয়তানের সাথে সদ্ভাব গড়ে তুললে, তাদের সাথে সদাচরণ দেখালে অনেক সময় তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু ইবলিস শয়তান থেকে

[১] . অর্থাৎ মানুষের ধন-সম্পদে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে সুদ-ঘুষ, আত্মসাত, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মাধ্যমে তা অর্জন করা এবং অন্যায় পথে তা ব্যয় করা। সন্তানে শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে ব্যভিচারের মাধ্যমে জারজ সন্তান পয়দা হওয়া। শয়তানের প্রতিশ্রুতি হচ্ছেঃ দুনিয়াটাই আসল, কোন পুনরুত্থান নেই, কোন হিসাব-নিকাশ বা প্রতিদান নেই, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর, দ্রঃ সূরা বানী ইসরাঈলের ৬৩ ও ৬৪ নং আয়াতের তাফসীর)

বাঁচার কোন কৌশল কাজে লাগে না। এই জন্যে যিনি তাকে সৃষ্টি করে তোমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন, তাঁর স্মরণাপন্ন হলে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাকে প্রতিহত করবেন এবং তোমাকে তার ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচিয়ে দিবেন তোমার বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিবেন।[১]

এই জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শয়তান থেকে বাঁচার পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

শয়তানের কুমন্ত্রনা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, শয়তান যখন তাদেরকে কুমন্ত্রনা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে যায়। (সূরা আরাফঃ ২০০-২০১)

---

[১] . তাফসীর ইবেন কাছীর ৭/১৮১ পৃঃ সূরা ফুস্সেলাত ৩৬ নং আয়াতের তাফসীর।

শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাঁর নবীজীকে আরো তালীম দিচ্ছেনঃ

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾

আর আপনি বলুন! হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার কাছে শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে আরো আশ্রয় কামনা করছি যে তারা (শয়তানরা) যেন আমার কাছে উপস্থিত হতে না পারে। (সূরা মু'মেনূনঃ ৯৭-৯৮)

তাওহীদই বান্দাকে শয়তান থেকে বাঁচাবেঃ

শয়তান থেকে বাঁচার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছেঃ বান্দা যদি তাওহীদকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে তথা একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহর কাছে যাবতীয় আশা-আকাংখা পেশ করে, ভালবাসা এককভাবে আল্লাহকে নিবেদন করে, নিজের যাবতীয় বিষয় যদি আল্লাহর উপর

সোপর্দ করে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহকে স্মরণ করে,[১] আল্লাহই একমাত্র তার কল্যাণ ও অকল্যাণের অধিকারী বিশ্বাস করে, পৃ থিবীরকোন কিছুই আল্লাহর নির্দেশ না হলে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এরকম দৃ ঢ়তা অন্তরে পোষণ করে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, দুনিয়ার কোন মানুষকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করে না, জীবন-মৃত্যুতে সাহায্য-সহযোগিতা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউ করতে পারে না এই বিশ্বাস রাখে এবং সেই সাথে আল্লাহর নির্দেশিত যাবতীয় ফরয ইবাদত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকে। মোটকথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান সমূহ যথাযথভাবে মেনে চলে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে

---

[১] . সাঈদ বিন যুবাইর (রহ:) আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা:) থেকে বলেন: শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে চেপে বসে থাকে। যখন সে ভুল করে বা উদাসীন হয়, তখনই সে কুমন্ত্রনা দেয়। অতঃপর যখন সে হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন সে পশ্চাতে সরে যায় কুমন্ত্রনা দেয়া ছেড়ে দেয়। (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা- ৭/ ১৩৫ পৃঃ)
ইবনু ছওর তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কুমন্ত্রনা দানকারী শয়তান বনী আদমের সুখে-দুঃখে তার অন্তরে ফুৎকার (প্ররোচনা) দেয়। কিন্ত আল্লাহ্কে স্মরণ করলেই শয়তান পশ্চাতে সরে যায়। (তাফসীর তাবারী- ৩০/৩৫৫পৃঃ)

সমস্ত পদ্ধতিতে শয়তান থেকে বাঁচার ব্যবস্থাপনা দিয়েছেন তার প্রতি আমল করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা নিজ করুণায় তাকে সবধরণের শয়তান থেকে রক্ষা করবেন, পরিত্রাণ দিবেন তাদের চক্রান্ত থেকে।[১]

---

[১] . নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করলে একজন মানুষ শয়তান থেকে বেঁচে থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ্।

১) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করা। যে সকল ক্ষেত্রে শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করতে হয় তা হল: ছালাতের শুরুতে, কুরআন তেলাওয়াত করার সময়, রেগে গেলে, সকাল-সন্ধায়, নিজগৃহে প্রবেশ করার সময়, দ্বীনের মৌলিক কোন বিষয়ে সন্দেহ হলে, স্ত্রী সহবাস করার আগে, ঘুমানোর সময়, কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে।

২) কুরআন তেলাওয়াত করা। বিশেষ করে সূরা বাক্বারা পাঠ করা। যে গৃহে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। (মুসলিম)

৩) ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করা। তাহলে সারা রাত তার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৪) বেশী ক্রোধান্বিত হলে আউযুবিল্লাহ... পাঠ করা এবং ওযু করা। কেননা তা একটি শয়তানী প্রবণতা। শয়তান আগুন থকে সৃষ্টি হয়েছে। আর পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

৫) অধিকহারে ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা। 'লাহওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্' বেশী বেশী পাঠ করা।

৬) শয়তানকে খুশী করে এমন আসবাব থেকে নিজ গৃহকে মুক্ত করা। যেমন বাদ্য-যন্ত্র, ঘন্টা, কুকুর, ছবি, প্রতিকৃতি, ভাষ্কর্য এবং যাবতীয় খেল-তামাশা ও গর্হিত বিষয়-বস্তু থেকে বাড়ীকে মুক্ত ও সংরক্ষণ করা।

৭) পরিবার এবং সন্তানদেরকে শরীয়ত সম্মত দু'আ-যিক্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে হেফাযত করা এবং এ ঝাড়-ফুঁক নিয়মমাফিক সবসময় করা। যেমন: আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস প্রভৃতি পাঠ করা। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৮) দৃষ্টি অবনত রাখা। পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকা। কেননা নারী যখন সামনে আসে তখন শয়তানের আকৃতিতে আসে আর যখন ফিরে যায় তখন শয়তানের আকৃতিতে ফিরে যায়।

৯) বেগানা নারীর সাথে নির্জন না হওয়া। কেননা উক্তাবস্থায় শয়তান তাদের তৃতীয়জন হিসেবে সেখানে বিরাজ করে।

১০) ইচ্ছাকৃত ভাবে শয়তানী কাজের বিরোধিতা করা। যেমন, ডান হাতে খানা-পিনা করা। কেননা শয়তান বাম হাতে খানা-পিনা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১১) অপব্যায় অপচয় না করা। কেননা অপব্যায়কারী শয়তানের ভাই। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ২৭)

১২) প্রতিটি বিষয়ে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা। কেননা তাড়াহুড়া শয়তানের কাজ এবং ধীরস্থীরতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (তিরমিযী)

১৩) সাধ্যানুযায়ী হাই উঠানোকে প্রতিরোধ করা। কেননা হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। হাই উঠানোর সময় [হা] করলে শয়তান হাসে। (বুখারী)

১৪) প্রত্যেক কাজের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা। কেননা বিসমিল্লাহ্ বললে শয়তান ক্ষুদ্র হয়ে যায় এমনকি মাছির মত ছোট্ট হয়ে যায়।

১৫) দিনে একশতবার পাঠ করা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।' তাহলে শয়তান প্রতিহত হবে।

১৬) প্রথম ওয়াক্তে ফজরের নামায আদায় করা। কেননা যে ফজর সালাত আদায় করবে সে আল্লাহ্‌র যিম্মাদারীর মধ্যে হয়ে যাবে।

১৭) সালাত অবস্থায় এদিক ওদিক না তাকানো। কেননা সালাতাবস্থায় এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (বুখারী)

১৮) বিনা প্রয়োজনে নারীর নিজ গৃহ থেকে বাইরে না যাওয়া। কেননা যখন সে বের হয় তখন শয়তান তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং উঁকি দিয়ে দেখে।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেনঃ

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

যারা ঈমানদার এবং যারা তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে তাদের উপর শয়তানের কোনই কর্তৃত্ব-ক্ষমতা নেই।" (সূরা নাহালঃ ৯৯)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾

নিশ্চয় আমার (প্রকৃত) বান্দাদের উপর তোমার কোনই কর্তৃত্ব নেই।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৬৫)

অতএব শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে বাঁচতে হলে, তার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। জীবনের সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে। সকলকে তাঁর উপরেই আশা-ভরসা রাখতে হবে এবং মহান আল্লাহর প্রকৃতঙআব্দ বা দাসে পরিণত হতে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই পরাজিত হবে শয়তান। বিজয়ী হবে আল্লাহর বান্দা।

---

১৯) স্ত্রী সহবাসের সময় দু'আ পাঠ করা। তাহলে সন্তান জন্ম হলে তাকে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পীর-দরবেশ শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারবে নাঃ

কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে পীর-দরবেশ অথবা আরেক দূর্বল মানুষকে শয়তান থেকে রক্ষাকারী খুঁজে বেড়াবে তাদের উপরই শয়তান কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে। আর যেহেতু আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন না, তাই তারা পীর-মুর্শিদদের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকবে। তাদেরকেই যে শয়তান বিভ্রান্ত করতে পারবে তার অঙ্গিকার সে আল্লাহর নিকট থেকে নিয়েই এসেছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

(শয়তান বলেছে) আপনার ইজ্জতের শপথ করে বলছি (হে আল্লাহ্!) আমি তাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করব। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা খালেছ বা

একনিষ্ঠভাবে আপনার ইবাদত করবে[১] তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারব না।" (সূরা সোয়াদঃ ৮২-৮৩)

এই জন্যে নবীকুল শিরমনী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে বিভিন্ন সময় শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দুআ করেছেন। নামায শুরু করার সময়[২] কুরআন তেলাওয়াত করার সময়[৩] এমনকি মৃ ত্যুর সময়ও যেন শয়তান ক্ষতি করতে না পারে তার প্রার্থনা মহা ক্ষমতাধর আল্লাহর কাছেই পেশ করেছেন।[৪] তিনি কোন পীর-মুর্শেদ ও ওলী-

---

[১] . অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে, উদ্ধারের প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, আশা-আকাংখ্যা, ভয়-ভরসা শুধু তার কাছেই রাখবে তাকে শয়তান কোনদিন বিভ্রান্ত করতে পারবে না- এমনকি মৃত্যুর সময়ও নয়।

[২] . নবী (সাঃ) নামাযের শুরুতে সানা পাঠ করার পর বলতেনঃ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ ونفثه "সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে আমি বিতাড়িত শয়তান, তার প্ররোচনা ও ফুঁৎকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম)

[৩] . এই বিষয়ে আল্লাহই নবীজীকে শিক্ষা দিয়েছেনঃ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "আপনি যখন কুরআন পাঠ আরম্ভ করবেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।" (সূরা নাহালঃ ৯৮)

[৪] . আবুল ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'আটি পাঠ করতেনঃ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ "হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, শয়তান যেন আমাকে মৃত্যুর সময় বিভ্রান্ত করতে না পারে (আমার বিবেক ও দ্বীন নষ্ট না করতে পারে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে।) (ছহীহ্ সুনান আবু দাউদ) প্রশ্নই উঠে না যে শয়তান নবী (সাঃ)কে

আউলিয়া খুঁজে বেড়াননি। কারণ আল্লাহ্ যদি কাউকে নিজ ক্ষমতায় সাহায্য-সহযোগিতা না করেন তবে কোন পীর-ওলী, মুর্শিদ-দরবেশ কাজে আসবে না। আর তিনি যদি কাউকে সাহায্য করেন তবে কোন পীর-ওলী, মুর্শিদ-দরবেশেরও দরকার পড়বে না।

পীর সাহেবের প্রতি কয়েকটি প্রশ্নঃ

এই পীর সাহেবদের মুরীদরা যদি বিশ্বের বিভন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকে (এবং আছেও তারা সেভাবে) আর যদি গাড়ী এক্সিডেন্ট, ভুমিকম্প, মহামারী বা অন্য কোন কারণে- একই সময় একাধিক স্থানে একাধিক ব্যক্তির মৃ ত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন কিভাবে পীর সাহেব সকল স্থানে একই সময় উপস্থিত হয়ে মুরীদদেরকে শয়তান থেকে হেফাযত করবেন?

নাকী পীর সাহেবের সাথে মালাকুল মওত তথা মৃ ত্যুর ফেরেশতার গোপন কোন চুক্তি আছে যে তিনি

মৃত্যুর সময় বিভ্রান্ত করতে পারবে। কিন্তু তিনি তাঁর উম্মতকে শয়তান থেকে বাঁচার জন্যে নিজে দু'আ পড়ে কিভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হতে হয় তার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি কিন্তু শয়তান থেকে বাঁচার জন্যে কোন পীর-বা মুর্শিদ খুঁজতে বলেননি। অতএব সাবধান হে মুসলিম জাতি।

না আসা পর্যন্ত যেন তার মুরীদের জান কবজ না করা হয়?

নাকী ইবলিস শয়তানকে তিনি পকেটে রেখেছেন তিনি যা বলবেন, শয়তান তাই শুনবে? নাকী শয়তানের সাথে পীর সাহেবের কোন কন্ট্রাক্ট আছে যে, এরা এরা আমার মুরীদ, তুই তাদের ঈমান লুট করতে পারবি না, অন্যথা তোর খবর আছে?

নাকী আল্লাহ্ পীর সাহেবকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন যে একই সময় তিনি একাধিক স্থানে গমণ করতে পারবেন এবং মুরীদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন? ক্ষমতা হস্তান্তরের কোথায় সেই চুক্তিপত্র আমরা একটু দেখতে পারি কি?

পীর নয় আল্লাহকে ধরুনঃ

সম্মানিত মুসলিম ভাই এবং মুরীদানদেরকে আহবান জানাচ্ছি আসুন! পীর নয়, আমরা আল্লাহকে ধরি, তাঁর প্রতি ঈমানকে দৃ ঢ় ও মজবুত করি। কেননা যারা প্রকৃত ঈমানদার তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্ সুদৃ ঢ়শাশ্বত বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। আর যারা যালিম তাদেরকে আল্লাহ্ রাখবেন বিভ্রান্তিতে; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা ইবরাহীমঃ ২৭)

তাদের নির্ভেজাল তাওহীদের কারণে, বিশুদ্ধ ঈমানের ফলে, একনিষ্ঠতার কারণে, আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকার ফলশ্রুতিতে, আল্লাহর দাবী বাস্তবায়ন করার পুরস্কার স্বরূপ- আল্লাহ্ তাদেরকে শাশ্বত বাণী কালেমায়ে তাওহীদের উপর অটল রাখবেন এবং শয়তান ও তার চক্রান্ত থেকে হেফাযত করবেন। আল্লাহর অঙ্গিকার মিথ্যা নয়। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সেই সুদৃ ঢ় ঈমানের অধিকারী করো। اللهمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ (আল্লাহুম্মা ইয়া মুকাল্লেবাল্ কুলূব ছাব্বেত কালবী আল দ্বীনেকা) হে অন্তকরণের পরিবর্তণকারী আল্লাহ্! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল-অবিচল রাখ। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى

طَاعَتِكَ (আল্লাহুম্মা মুসার্‌রেফাল কুলূব সার্‌রেফ কুলূবানা আলা ত্বাআতেকা) হে অন্তকরণকে প্রবাহিতকারী আল্লাহ্! আমাদের অন্তরগুলোকে তোমার আনুগত্যের কাজে প্রবাহিত করো।" (মুসলিম)[১]

৩) পীর সাহেব কি গুনাহ মাফ করানোর মাধ্যম?

চরমোনাই পীর সাহেব লিখেছেনঃ *পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার অর্থ আল্লাহ পাকের কাছে মানুষের বিক্রি হইয়া যাওয়া। পীর সহেব শুধু উছীলা মাত্র। বান্দা অসংখ্য গুণাহ করার ফলে আল্লাহ্ পাক তাহাকে কবুল করিতে চান না। পীর সাহেব আল্লাহ্ পাকের দরবারে অুনয় বিনয় করিয়া ঐ বান্দার জন্য দু্আ করিবেন, যাহাতে তিনি তাহাকে কবুল করিয়া নেন।"* (ভেদে মারেফতঃ ৩৪ পৃ)

[১] . রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজে এই দু'আ দুটি পাঠ করতেন এবং বলতেন, "সকল বান্দার অন্তর সমূহ আল্লাহর দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন সময় বান্দার অন্তরের মধ্যে পরিবর্তন করে দিতে পারেন।" অতএব এই দৃঢ়তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। যাতে করে তিনি অন্তরকে ঈমানের উপর অটল রাখেন এবং কুফরী, মুনাফেকী ও অবাধ্যতার দিকে পরিবর্তন না করেন।

জনাব পীর সাহেব! দয়া করে বলবেন কি বান্দা গুণাহ করলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করতে চান না এ কথা আপনি কোথায় পেলেন? কুরআনের আয়াত বা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাদীছে কি এরকম কোন কথা আছে? নাকি আল্লাহ্ আপনাকে ওহী করে একথা বলেছেন? তাই আপনি গুনাহগার বান্দাকে আল্লাহর দরবারে কবুল করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।

যে সমস্ত বান্দা অসংখ্য গুনাহ করেছেন কিন্তু আল্লাহর দরবারে কবুল পাওয়ার জন্য তারা এখনও আপনার দরবারে যায়নি বা অন্য কোন পীর সাহেবের উছিলা করেনি, তাদেরকে কি তাহলে আল্লাহ্ মাফ করবেন না? গুনাহের পাহাড় মাথায় নিয়ে তারা নিজেরা যদি দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও আল্লাহ্ তাদের কবুল করবেন না? তাদের মুখে হয়তো আপনাদের মত সুললিত কন্ঠে ভাষা বের হবে না; কিন্তু ভগ্ন হৃদয়ে একনিষ্ঠ মনে তারা যদি মহাদয়াবান করুণাময়ের সামনে চোখের পানি ফেলে বুক ভাষায় তবুও কি তারা আপনাদের উছিলা না

করার অপরাধে(?) ব্যর্থ হয়ে যাবে? আল্লাহ্ কি বান্দার প্রতি এতই কঠোর?

সাহাবী জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ব যুগের একজন লোকের কথা উল্লেখ করলেন, লোকটি বলেছিল: আল্লাহর শপথ উমুক লোকটিকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন, কে সেই যে আমার উপর শপথ করে বলছে, আমি উমুককে ক্ষমা করব না? আমি উমুককে ক্ষমা করে দিলাম, আর তোমার যাবতীয় আমল ধ্বংস করে দিলাম।? (সহীহ্ মুসলিম)

পীর সাহেবের উল্লেখিত উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, পীর সাহেবের কোন গুনাহ্ হয় না বলেই তিনি অন্যের গুনাহ্ মাফ কারানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

আদম সন্তান সকলেই গুনাহ্ করে, গুনাহকারীদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তাওবা করে।[1]

পীর সাহেবের কথায় আরো বুঝা যায় যে, তার মুরীদগণ সকলেই গুনাহগার। তাই তিনি তাদের গুনাহ মাফের ওকালতীর দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি কি করে জানলেন যে তার মুরীদ অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত হয়েছে? অথচ কার কতটুকু গুনাহ্, কে কত বড় গুনাহগার তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন, ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ "আপনার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের গুনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখেন এবং তা দেখেন।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১৭)

আল্লাহ্ই ক্ষমাকারীঃ

আল্লাহ্ তালার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে যেমনঃ غفور গাফূর, غفار গাফ্ফার, عفوٌّ আফুউ, সবকটির অর্থ মহান ক্ষমাশীল। তিনি تواب (তাওয়াব) বান্দার তওবা কবুলকারী। এজন্যে বান্দা গুনাহ করে

[1] . আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ সহীহুল জামে হা/৮৬৪৪ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি খুশি হন। ক্ষমা না চাইলে বেজার হন। তাঁর দরবার সকলের জন্যে উন্মুক্ত, তাঁর দরজা কারো জন্যে বন্ধ নয়। তিনি দুনিয়ার রাজা-বাদশাহের মত যালেম-অত্যাচারী নন যে, তাঁর কাছে পৌঁছার জন্যে মন্ত্রী-এমপির দরকার পড়বে বা তিনি সরাসরি বান্দার কথা শুনবেন না। বান্দা যতবড় অপরাধ করুক, যত বেশী গুনাহ্ করুক যে কোন সময় তাঁর কাছে যেতে পারবে। তাই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে কোন পীর বা ওলী-আউলিয়া ধরে তার মাধ্যমে যেতে হবে না।

বান্দা তাকে ডাকলেই তিনি তার ডাকে সাড়া দিবেন এই অঙ্গিকার করেছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার কাছে দুআ করে না- দুআ করতে অহংকার করে- তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মেনঃ ৬০)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দিনঃ নিশ্চয় আমি তাদের সন্নিকটেই। কোন ব্যক্তি যখনই আমাকে আহ্বান করে, তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে। (সূরা বাকারাঃ ১৮৬)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপরাশী ক্ষমা করেন, আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। (সূরা শূরাঃ ২৫)

আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেনঃ

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিন সমপ্রদায় তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (সূরা নূরঃ ৩১)

করুণাময় মহিয়ান আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا،إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

আর যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবূদ হিসেবে ডাকে না, যথার্থ কারণ ছাড়া আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। বস্তুতঃ যে এগুলো করলে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং তথায় হীন অবস্থায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। তবে তারা নয়, যারা (খাঁটি) তওবা করে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে; বরং আল্লাহ (তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং) তাদের পাপসমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকানঃ ৬৮-৭০)

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত আয়াতগুলোতে কিন্তু আল্লাহকে ডাকার জন্যে কোন মাধ্যম ধরতে বলা হয়নি। এ ধরণের আয়াত পবিত্র

কুরআনে আরো অসংখ্য রয়েছে। বিবেকবানের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব যে কোন বান্দা সরাসরি নিঃসঙ্কচে আল্লাহকে ডাকতে পারে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে, তাঁর দরবারে ফিরে যেতে পারে, তাঁর কাছে তওবা করতে পারে। কারো কোন উসীলার দরকার নেই। কোন ওলী-আউলিয়া বা মুরশেদ ধরে তাঁকে ডাকতে হবে না।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে কোন্ সময় কোন্ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ বান্দাকে মাফ করবেন তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

)يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ(

প্রত্যেক রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার আকাশে

অবতরণ করেন, অতঃপর বলেন, আমিই প্রকৃত বাদশাহ, আমি রাজাধিরাজ কে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে আমার কাছে কোন কিছু চাইবে করবে আমি তাকে প্রদান করব, কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। এভাবে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত তিনি বান্দাদের ডাকতে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে ডেকে বলেন, হে আমার বান্দাগণ তোমরা দিবারাত্রি পাপ কর্ম কর, আর আমি সকল পাপরাশী ক্ষমা করি। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। (সহীহ্ মুসলিম)

আবু যার্র (রাঃ) হাদীছে কুদসী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي)

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ হে আমার বান্দারা আমি যাকে হেদায়াত করি সে ছাড়া তোমরা সকলেই বিভ্রান্ত। অতএব তোমরা আমার কাছে হেদায়াত চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব। আমি যাকে সম্পদশালী করি সে ছাড়া তোমরা সবাই ফকীর। অতএব তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিব। আমি যাকে নিরাপদ রাখি সে ব্যতীত তোমরা সকলেই গুনাহগার। যে ব্যক্তি জানবে যে আমি মাগফিরাতের ক্ষমতা রাখি অতঃপর সে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব, আমি কোন পরোয়া করিনা।[১]

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ আরো ঘোষণা করেছেনঃ

(يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ)

হে আদম সন্তান! যখনই তুমি আমায় আহ্বান করবে এবং আমার নিকট আশা-আকাংখা পেশ করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব, তোমার

---

[১] . তিরমিযী হা/২৪১৯ দ্রঃ ছহীহ তারগীব তারহীব হা/ ১৬২৫।

পাপরাশী যত অধিক থাক না, এতে আমি কোন পরোয়া করি না।

হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ সমূহ যদি আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে যায়। অতঃপর তুমি আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিব। এতে আমি কোন কিছুর তোয়াক্কা করি না।[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ

)إِنَّ لِلتَّوْبَةِ باباً عَرْضُ ما بَيْنَ مِصْرَعَيْهِ ما بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وفي رواية: (عَرْضُهُ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ عاماً) لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهاَ(

নিশ্চয় তওবার একটি দরজা আছে। উহার প্রশস্ততা পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত সম। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ উহার প্রশস্ততা সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর। পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না।[২]

কোন দেশে অপরাধীদের ব্যাপারে যদি সে দেশের প্রেসিডেন্ট বা বাদশা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে আর

---

[১] . তিরমিযী, সহীহুল জমে হা/৪৩৩৮

[২] . ত্বাবারনী, হাদীছ সহীহ্ দ্রঃ সহীহুল জামে হা/২১৭৭।

বলে দেন যে, অপরাধী নিজে রাষ্ট্রপ্রধান বরাবর দরখাস্ত লিখে আত্মসমর্পণ করে তবে তাকে ক্ষমা করা হবে, তার দন্ড মওকুফ করা হবে, তাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। আর এর জন্যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়, তখন কিন্তু অপরাধীর আর ভাবনা থাকবে না, নিজেকে মুক্ত করার জন্যে কারো কাছে ধর্ণা দেয়ার দরকার মনে করবে না। উকীল-ব্যারিস্টার নিয়োগ করার জন্যে কাউকে খুঁজে বেড়াবে না, কারো সাথে চুক্তি সম্পাদন করার চিন্তা তার মাথায় আসবে না। নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করবে।

মহান আল্লাহর সাথে কারো উদাহরণ পেশ করা সমীচিন নয়। মহান আল্লাহ্ রাজাধিরাজ মহা প্রতাপশালী ক্ষমতাবান, বান্দাদের অপরাধ মার্জনা করার জন্যে সবসময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেই রেখেছেন। শুধু তার সর্বশেষ সময়সীমা হচ্ছে মৃ ত্যু উপস্থিত হওয়া। মৃ ত্যুরগরগরা আসার আগে কেউ যদি তাঁর সুমহান দরবারে যথাযথভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে, তবে সে তাঁর সীমাহীন করুণার সাগরে ডুব দিয়ে নিজেকে পূত-পবিত্র করতে সক্ষম হবে

এবং আখেরাতে নাজাতের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিবে। কিন্তু যেহেতু মানুষ জানেনা কখন তার মৃ ত্যু আসবে, সেহেতু সর্বদা তওবা-ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকবে। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাদা তওবা-ইস্তেগফারে ব্যস্ত থাকতেন। অথচ তাঁর কোন গুনাহই ছিল না। মৃ ত্যুরপূর্বে তওবা করে নিব এমন ধারণা করে বসে থাকবে না। অথবা আজ নয় কাল তওবা করব এভাবে কালক্ষেপণ করবে না।

বান্দার তওবায় আল্লাহ্ খুশিঃ

এজন্য কোন মানুষ যদি আল্লাহর কাছে তওবা করে, তবে তিনি খুবই খুশি হন এবং সন্তুষ্ট হন উক্ত বান্দার প্রতি।

একজন মানুষ জনমানবহীন মরুভূমিতে গিয়ে নিজের বাহণ হারিয়ে, খাদ্য-পানীয় হারিয়ে যখন মৃ ত্যু প্রহর গুনতে থাকে এমন সময় হঠাৎ সে তার বাহণ ও খাদ্য-পানীয় ফিরে পেয়ে সাক্ষাৎ মৃ ত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় যেমন আনন্দিত হয়, বান্দা পাপ করতে করতে শয়তানের দলে শামিল হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ যখন অনুতপ্ত হয়, নিজের ভুল বুঝতে পারে ফিরে

আসে মহান করুণাময় আল্লাহর কাছে এবং খাঁটি মনে তওবা করে তাঁর দরবারে তখন তিনি তার প্রতি খুশি হয়ে যান। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি নিজের জান ফেরত পাওয়ায় যতটুকু আনন্দিত হয়, তওবা করলে আল্লাহ তার চেয়ে বেশী বান্দার উপর খুশি হন।[১]

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীছগুলো দ্বারা বুঝা যায় কোন মানুষ যদি ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবী, রাহাজানি ইত্যাদি মহাঅন্যায় করে, এমনকি শির্ক-কুফরীতে লিপ্ত হয়, নামায-রোযা পরিত্যাগ করার মত বিশাল অপরাধে জড়িত হয়, অতঃপর দুনিয়ার জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই অনুতপ্ত হয় এবং খাঁটি মনে তওবা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তাকে ক্ষমা করতে পারবে না, কেউ গুনাহের সাগর থেকে উদ্ধার করতে পারবে না, তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। পূর্বের সমস্ত পাপকে ধ্বংস করে দিবেন। তিনি কারো

[১] . বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী হারেছ বিন সুওয়াইদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সারাংশ।

পরোয়া করেন না। কেননা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ)) পাপ থেকে তওবাকারী এমন ব্যক্তির ন্যায় যার কোনই পাপ নেই।[1]

শির্ক নিয়ে মৃ ত্যুবরণ করলে ক্ষমা নেইঃ

বরং কোন মানুষ যদি শির্ক ও কুফরীর নিম্ন পর্যায়ের উক্ত পাপগুলো নিয়ে তওবা না করেই মৃ ত্যু বরণ করে, তবুও সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে দিয়ে দিবেন, ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু শির্ক নিয়ে মৃ ত্যু বরণ করলে আল্লাহ্ তকে মাফ করবেন না। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

আল্লাহর সাথে শির্ক করা হলে সে পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। আর যাকে ইচ্ছা তিনি এর নিম্নপর্যায়ের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। (সূরা নিসাঃ ৪৮ ও ১১৬)

---

[1] . সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ হা/৪২৫০, সহীহুল জামে হা/৩০০৮।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

)وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً(

যে ব্যক্তি পৃ থ্বিী পূর্ণ পাপের বোঝা নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হবে, এ অবস্থায় যে সে আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি, তাহলে পৃ থিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে আমি তার সামনে উপস্থিত হব।[১]

অতএব সন্দেহ নেই যে, কোন মানুষ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করার পর তওবা না করে মৃ ত্যুবরণ করে তবে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না। আর ঐ মুশরেকের জন্যে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। তার চিরকালীন ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা মায়েদাঃ ৭২)

---

[১] . সহীহ্ মুসলিম হা/ ৪৮৫২।

দুআয় পীর-ওলীকে উসীলা করা শির্ক না তাওহীদ?

পীর ধরা বৈধ করার জন্যে চরমোনাই পীর সাহেব পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৩৫নং আয়াতটি উল্লেখ করে দলীল পেশ করেছেন।[১] মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য অনুসন্ধান কর ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক, আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা মায়িদাঃ ৩৫)

আরবী অভিধানে ও কুরআনে উসীলার অর্থঃ

ইবনুল আছীর [নিহায়া ফী গারীবিল আছার ৫/৪০২ পৃ] গ্রন্থে বলেন, الواسل অর্থ- আগ্রহী,

---

[১] . দেখুন পীর সাহেবের বই ভেদে মারেফতঃ ১১ পৃঃ।

الوسيلة উসীলাঃ নৈকট্য ও মধ্যস্থতা। যার মাধ্যমে কোন বস্তুর কাছে পৌঁছা যায় ও তার নিকটবর্তী হওয়া যায়। এর বহুবচন হচ্ছে **وسائل**

ফিরোযাবাদী [আল ক্বামূসুল মুহীত ৩/১৭৮] গ্রন্থে বলেন, وَسَّلَ إلى الله تعالى توسيلاً অর্থ- এমন কিছু আমল করেছে যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে।

এছাড়া **الوسيلة** শব্দটির অন্য আর একটি অর্থ রয়েছে। তা হচ্ছে, মালিক বা বাদশাহ্‌র দরবারে সম্মান, মর্যাদা, ও নৈকট্য। যেমনি হাদীছে শব্দটির ব্যবহার ও জান্নাতে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানের অর্থে হয়েছে।[১]

কুরআনে উসীলার অর্থঃ

---

১ . রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, “মুআয্‌যিনের আযান শুনে তোমরা তার জবাব দাও। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। এরপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে উসীলা চাইবে। কেননা উহা জান্নাতের একটি স্থানের নাম। যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে থেকে একজন বান্দার জন্যই নির্ধারিত। আশা করি আমি সেই বান্দা। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে।” (সহীহ্ মুসলিম)

পূর্বেল্লেখিতি অর্থগুলোই অভিধানে স্বীকৃত। এতে কোন মতবিরোধ নেই। এই কারণে সালাফে ছালেহীন ও তাফসীরের ইমামগণ কুরআনে**الوسيلة** শব্দটির ব্যাখ্যা সেভাবেই করেছেন, যেভাবে অভিধানে তার অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর তাঁর নেকট্য অনুসন্ধান কর। তাঁর পথে জিহাদ কর। তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে। (সূরা ময়েদাহ্- ৩৫)

তিনি আরো বলেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

ওরা (মুশরিকগণ) যাদেরকে আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য (উসীলা) অনুসন্ধান করে, কোন জিনিসটি সর্বাধিক নিকটবর্তী। তারা তাঁরই করুণার আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে

ভয় করে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার শাস্তি অবধারিত।" (সূরা বানী ইসরাঈল- ৫৭)

প্রথম আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমামুল মুফাস্‌সেরীন হাফেয ইবনু জারীর ত্ববারী (রহঃ) বলেন, ওহে তোমরা যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করেছো, তাঁদের সংবাদ সমূহ, ছওয়াবের অঙ্গিকার ও শাস্তির ধমক.. ইত্যাদি মেনে নিয়েছো- তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। অর্থাৎ- আনুগত্যের সাথে তাঁর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন কর। আর তাঁর কাছে পৌঁছার জন্যে উসীলা অনুসন্ধান কর, অর্থাৎ- واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه তাঁকে সন্তুষ্টকারী কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর।[১] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে যে অর্থ সংকলন করেন, তা হচ্ছে- **الوسيلة** অর্থঃ নৈকট্য। অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে তাবেঈ মুজাহিদ, আবু ওয়ায়েল, হাসান বাছরী, আবদুল্লাহ্ বিন কাছীর, সুদ্দী, ইবনু যায়দ প্রমুখ থেকে। ইবনে কাছীর ক্বাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, ক্বাতাদা বলেন: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما

[১] . তাফসীরে তাবারীঃ ১০ম খন্ড, ২৯০ পৃঃ।

ﻮﻳﺮﺿﻴﻪআল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁকে সন্তুষ্টকারী আমল দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন কর। এরপর ইবনু কাছীর বলেন, ইমামগণ থেকে বর্ণিত উক্ত তাফসীরগুলোর মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কেননা উসীলা হচ্ছে- যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছা সম্ভব।[১]

তাফসীরবিদদের মতে দেখা যায়, আল্লাহ্ যে উসীলা অনুসন্ধান করতে বলেছেন, তার ওপীর অনুসন্ধান করার অর্থে ব্যবহার হয়নি। এধরণের অর্থ তাফসীরবিদ কেন কোন ইমাম বা মুহাদ্দেছই করেননি। কারণ কোন পীর মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। একজন মানুষ কিভাবে আরেক মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারে? যে বস্তুটি মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিতে পারে, যে বিষয়টি বান্দাকে তাঁর কাছে কবুল করাতে পারে তা হচ্ছে নিরঙ্কুশ তাওহীদ ও নেক আমল- এছাড়া অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীরে সম্মানিত ছাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আয়াতটি একদল মুশরিক আরবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

---

[১] . ইবনু কাছীর- ৩/১০৩ পৃঃ

তারা কতিপয় জিনের ইবাদত করত। সেই জিনেরা মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু ঐ মুশরিকরা তাদের ইসলামের কথা জানতো না।[১]

হাফেয ইবনু হাজার (রাঃ) বলেন,„অর্থাৎ যে সকল মানুষ জিনদের ইবাদত করতো তারা তাদের ইবাদত করতেই থাকলো। কিন্তু জিনেরা সেটা পছন্দ করছিল না, কেননা তারা তো মুসলমান হয়ে গেছে। তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, তারাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় ও পন্থা অনুসন্ধান করছে।" এটাই হচ্ছে এ আয়াতের নির্ভরযোগ্য তাফসীর।[২]

ইমামদের থেকে উসীলার এই অর্থ বর্ণনা করার পর আমরা দেখব জীবিত বা মৃত কোন মানুষকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বিশ্বাস করলে তাওহীদ ঠিক থাকে কি না?

মক্কার কাফেরদের ঈমান ও ইবাদতঃ

[১] . মুসলিম ৮/২৪৫ নভুবী, অনুরূপভাবে বুখারী ৮/৩২০-৩২১ ফাতহুলবারী। বুখারীর বর্ণনায় বলা হয়, জিনেরা মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু মুশরিকগণ তাদের ইবাদত করতেই থাকল।

[২] . ফাতহুল বারী ১০/১২, ১৩।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)কে আল্লাহ্ এমন জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যারা আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করত, বিশ্বাস করত যে তিনিই সৃষ্টিকর্তা, হায়াত-মওতের মালিক, রিযিকদাতা, বৃষ্টিদাতা, তিনিই আরশের মালিক, তিনিই আশ্রয়দাতা। শুধু তাই নয় কাফেররা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, তাঁর ইবাদত করত, কাবা ঘরের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সাঈ করত, হজ্জ করত, দান-সাদকা করত। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা কিছু লোককে তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা নির্ধারণ করত। তারা যুক্তি পেশ করত যে, আমরা এই মধ্যস্থতাকারী লোকদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য চাই, আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চাই। তারা আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। এমনকি কাফেররা যে সকল মূর্তীর পূজা করত তারা সকলেই স্বীকার করত যে, এ মূর্তীগুলো সকলেই আল্লাহর রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও আয়ত্বের মধ্যে।

আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান কেমন ছিল তার পরিচয় আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

(হে নবী ﷺ) আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুনঃ কে তিনি, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমিন হতে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, (এসব কিছু একমাত্র) আল্লাহই (করে থাকেন)। অতএব আপনি বলুনঃ তবে কেন তোমরা শিরক হতে বেঁচে থাকছো না? (সূরা ইউনুসঃ ৩১)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾

(হে নবী ﷺ) আপনি কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে, তবে বল তো এই পৃ থিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কার অধিকারে? তৎক্ষণাত তারা জবাবে বলবেঃ আল্লাহর অধিকারে। বলুন, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তাদেরকে আরো জিজ্ঞেস করুন, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি? তারা জবাব দিবে, আল্লাহই এর অধিপতি। বলুন, তারপরও কি তোমরা সাবধান হবে না? ওদেরকে আরো প্রশ্ন করুন, তোমরা যদি জানো তবে বল তো, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর কেউ আশ্রয়দাতা নেই? তারা বলবে, এসব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। আপনি তাদেরকে বলুন, এরপরও কেমন করে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো? (সূরা মু'মেনূনঃ ৮৪-৮৯)[১]

সূরা ফীলের তাফসীর পড়লে আমরা বুঝতে পারি আবরাহা বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য মুশরিকরা কিভাবে বিষয়টিকে মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছিল। কি দৃ ঢ়বিশ্বাস ও অগাধ আস্থা ছিল তাদের

[১] . এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলোও দেখা যেতে পারে যে আল্লাহর উপর কাফেরদের কোন ঈমান ছিল কি না? সূরা ইউনুসঃ ৩১, আনকাবূতঃ ৬১, লোকমান ২৫, যুমারঃ ৩৮, যুখরুফঃ ৯ ও ৩৮ ।

আল্লাহর উপর। বলেছিল, আল্লাহর ঘর আল্লাহই রক্ষা করবেন। এখানে আমাদের করণীয় কিছু নেই।

শুধু তাই নয়, মুশরিকরা হজ্জের মওসুমে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধত তালবিয়া পড়ত। তাদের তালবিয়ার বাক্য ছিল এরূপঃ লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান্ হুওয়া লাকা, তাম্লেকুহু ওয়ামা মালাক। (আমি হাজির, আমি হাজির হে আল্লাহ্, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, তবে তোমার সেই শরীক ব্যতীত- তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক তুমি তারও মালিক।)[১]

তারা হজ্জ করত বলেই তো প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) হাজীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে মদীনা (ততকালিন ইয়াছরেব) থেকে মুশরেক অবস্থায় হজ্জ করতে এসে কতিপয় গোপনে নবীজীর দাওয়াত পেয়ে মুসলমান অবস্থায় নিজ দেশে ফেরত গিয়েছেলেন। তাদের দ্বারাই ইসলামী সমাজের বীজ

---

[১] . দেখুন ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় সহীহ্ মুসলিমে অনুচ্ছেদ: 'তালবিয়া ও তার পদ্ধতি' হা/ ২০৩২।

বপন হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের মহিরূহ আকারে নবীজীর হিজরতের পর প্রকাশ পেয়েছিল।

মক্কার লোকদেরকে কেন মুশরিক বলা হয়েছে?

আল্লাহর প্রতি এত বিশ্বাস ও এই ইবাদতের পরেও কিন্তু তাদেরকে মুশরেক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কুরায়শদের আল্লাহকে স্বীকার করা- তিনি জগতের কর্তৃত্বকারী ঘোষণা দেয়া বা তাওহীদে রুবুবিয়্যাকে মান্য করা ইসলামে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদেরকে মুশরিক ঘোষণা প্রদান এবং তাদের জান-মাল হালাল করার মূল কারণ ছিল, তারা ফেরেশতা, নবী এবং ওলী-আউলিয়াকে শাফাআতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য তাদেরকে উসীলা মনে করেছিল। ওলী-আউলিয়াদেরকে মূর্তী আকারে বানিয়ে তারা কাবা ঘরে বা নিজেদের বাড়ীতে রাখতো এবং ঐ সমস্ত আল্লাহ্ প্রেমিকের উসীলা ধরে আল্লাহকে ডাকতো।

উদ্দেশ্য একটাই তারা যেন তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে দেন এবং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। কেননা আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং তারা আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক। তাদের এই যুক্তিকে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা যুমারঃ ৩) মূর্তীগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার আশা করাটাই তাদের ইবাদত করা। অতএব এখনও কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, কোন মানুষ তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। যেমন মুশরিক ছিল মক্কার মূর্খ লোকেরা।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে, কাফেররা মুর্তিদের নিকট থেকে কল্যাণ পাওয়ার আশা করতো। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহই

শুধুমাত্র উপকার-অপকার ও কর্তৃত্বের মালিক। নেককারদের হাতে কোন কিছু নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সুপারিশের উদ্দেশ্যে নেককারদের কাছে গমণ করে থাকি।

উত্তরে আমরা বলব এ কথাটি হুবহু কাফেরদের কথার অনুরূপ। তারাও আল্লাহকে সকল কিছুর কর্তৃত্বের মালিক বিশ্বাস করত এবং শুধুমাত্র সুপারিশ পাওয়ার আশায় তাদের কাছে যেত। আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

ওরা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যে তাদের কোন উপকার এবং অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। তারা বলে, এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

অতএব সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দুআয় পীর সাহেবকে উসীলা করা প্রকাশ্য শির্ক এবং একাজ মক্কার কাফের মুশরিকদের অনুসরণ-অনুকরণ।

আল্লাহ্ কাকে শাস্তি দিবেন কাকে দিবেন না, কাকে কবুল করবেন কাকে কবুল করবেন না এটা একান্ত তাঁর ইচ্ছাধীন বিষয় এখানে কারো কোন

অধিকার নেই। আর আল্লাহ্ কারো কাছে সে বিষয়ে কৈফিয়ত দিবেন না। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾

তোমাদের পালনকর্তা ভাল জানেন, তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি করুণা করবেন চাইলে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। হে নবী আপনাকে আমি তাদের উপর কর্তৃত্বকারী হিসেবে প্রেরণ করিনি।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৪)

একটি প্রশ্নঃ পীর সাহেবের দাবী মতে *গুনাহগার বান্দাকে আল্লাহ কবুল করতে চান না, তখন তিনি দুআ করে কাকুতি মিনতী করে আল্লাহর কাছে তাকে কবুল করিয়ে দেন।* পীর সহেবকে কি আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন? জবাব যদি হ্যাঁ হয়, তবে প্রশ্ন কার দুআয় তিনি আল্লাহর কাছে কবুল পেলেন? তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেয়া যায় যে, আল্লাহ্ তাকে কবুল করে নিয়েছেন, তবে প্রশ্ন হচ্ছেঃ কিভাবে তিনি জানলেন যে আল্লাহ্ তাকে কবুল করে নিয়েছেন? তার কাছে কোন ওহী নাযিল হয়েছে?

আরেকটি প্রশ্নঃ যদি পীর সাহেবের দুআয় আল্লাহ্ মানুষকে কবুল করে নেন, তবে তো আমলের দরকার পড়ে না? আর যদি বলা হয় যে অধিক আমল ও পীরের দুআর মাধ্যমে আল্লাহ্ কবুল করবেন, তবে তো পূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীছগুলো মিথ্যা হয়ে যায়। কেননা সেখানে তো শুধু আমলকেই কবুল হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন নবী-ওলীকে মাধ্যম ধরতে বলা হয়নি।

অবশ্য নেক লোকেরা আরেকজনের জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে কবুল করাতে পারেন না। কেননা কোন পীরের সাথে আল্লাহর চুক্তি নেই যে, তিনি দুআ করলেই আল্লাহ্ তাকে কবুল করে নিবেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

তাওহীদ সম্মত উসীলাঃ

ইসলামী শরীয়তে বৈধ উসীলা মাত্র তিন প্রকার।

১) আল্লাহ্ তাআলার সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা উসীলা গ্রহণঃ এই উসীলার পক্ষে দলীল হচ্ছে, আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

আর আল্লাহ্‌র অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। সেই নামের মাধ্যমে তোমরা তাঁকে আহবান কর। (সূরা আ'রাফ- ১৮০) অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর সুন্দর সুন্দর নামের উসীলায় আহবান কর। আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন বিষয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দুর্ভাবনায় ফেলত, তখন তিনি বলতেন,

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ﴾

হে চিরঞ্জিব, চিরস্থায়ী আপনার করুণার উসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করছি। (তিরমিযী, হাকেম, হাদীছ হাসান)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনতে পেলেন জনৈক ব্যক্তি দুআ পাঠ করছে:

)اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجنة وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ(

হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, কেননা সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য নিবেদিত, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তুমি একক তোমার কোন শরীক নেই। তুমি সার্বিক উপকার সাধনকারী।

হে আকাশমন্ডলি ও পৃথিবীর স্রষ্টা। হে সম্মান ও মহত্বের অধিকারী। হে চিরঞ্জিব চিরস্থায়ী। আমি আপনার কাছে জান্নাত চাইছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের বললেন, তোমরা জান সে কি দুআ করেছে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, শপথ সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্‌র সুমহান নামের (ইসমে আযম) উসীলায় দুআ করেছে। যে নামে তাঁকে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন, তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করেন। (আবু দাঊদ, নাসাঈ, আহমাদ, সনদ ছহীহ্)

২- ঈমান ও সৎ আমলের উসীলা করাঃ মুসলিম ব্যক্তি এভাবে দুআ করবেঃ হে আল্লাহ্ আপনার প্রতি আমার ঈমান, ভালবাসা, আপনার রাসূলের আনুগত্যের উসীলায় প্রার্থনা করছি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

অথবা এরূপ বলবে, হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আমার

ভালবাসা ও ঈমানের উসীলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার বিপদ দূর করুন।

অথবা দুআ করার সময় নিজের এমন গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল উল্লেখ করবে, যা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌কে ভয় করে হয়েছে, সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁর রেযামন্দি ও সন্তুষ্টি কামনা করা হয়েছে, এককভাবে তাঁরই আনুগত্য করা হয়েছে, তারপর তার উসীলা করে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবে। আশা করা যায় এধরণের দুআ গ্রহণীয় হওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ব যামানায় তিন ব্যক্তি একদা একটি গর্তের মধ্যে আটকা পড়ে। প্রকান্ড একটি পাথর গর্তের মুখে গড়িয়ে পড়ে, ফলে তারা বের হতে পারছিল না। তখন তারা নিজেদের নেক আমলগুলোর উসীলা করে উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিল। প্রথম ব্যক্তি উসীলা করেছিল পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে, তাদের প্রতি তার দয়া ও অত্যধিক অনুকম্পা প্রদর্শনকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যভিচারের কলুষতা থেকে পবিত্রতাকে উসীলা করেছিল। আর

তৃতীয় ব্যক্তি শ্রমিকের পারিশ্রমিক সংরক্ষণ করাকে উসীলা হিসেবে উল্লেখ করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেন। পাথরটি অলৌকিকভাবে গর্তের মুখ থেকে সরে যায়। তারাও নিরাপদে বের হয়ে আসে।[১]

তারা কোন পীরের হাতে বায়আত না করার পরও আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন- শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে সম্পাদিত আমলের উসীলায়।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেনঃ এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই তিনজন মুমিন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়লে, দুনিয়া তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে উঠলো, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য একমাত্র আল্লাহ্র দরবার ছাড়া সকল পথ থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন তারা তাঁর করুণা ভিক্ষা চাইল, একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালো। আর মাধ্যম হিসেবে পেশ করল নিজেদের ঈমান ও কিছু নেক আমলের। আমলগুলো তারা সুখের সময় আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্যই করেছিল- এই আশা রেখে যে, বিপদের সময় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু

[১]. হাদীছটি আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সুখের সময় তুমি আল্লাহ্‌কে চেন (তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে)। দুঃখের সময় তিনি (দুঃখ দূর ও বিপদ মোচনের মাধ্যমে) তোমাকে চিনবেন।[১]

৩- নেক লোকের দুআর উসীলা করাঃ অর্থাৎ এমন একজন নেক ব্যক্তির কাছে দুআর আবেদন করা যিনি জীবিত আছেন এবং তিনি দুআর আবেদনকারীর সামনে উপস্থিত আছেন। মৃত কোন নবী বা ওলীর কাছে যেমন দুআর আবেদন রাখা যাবে না অনুরূপ জীবিত কিন্তু অনুপস্থিত এরকম কোন ওলী-আউলিয়ার কাছেও দুআর আবেদন করা যাবে না।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে দুর্ভিক্ষ দেখা গেল। তিনি একদা জুমআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে প্রবেশ করল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির

[১] . ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আহমাদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ্। দ্রঃ আত্‌তাওয়াস্‌সুল আন্‌ওয়াউহু ও আহ্‌কামুহু- আলবানী ৩৮ পৃঃ।

অভাবে) সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল, পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্থ হয়ে গেল (অন্য বর্ণনায়, ঘোড়া, ছাগল মারা যাওয়ার উপক্রম হল।) তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করুন। তিনি দুহস্ত উপরে উত্তোলন করলেন। এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্র অংশ দেখতে পেলাম। তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ্ আমাদের উপর বৃ ষ্টিবর্ষণ করুন! হে আল্লাহ্ আমাদের উপর বৃ ষ্টি বর্ষণ করুন!! হে আল্লাহ্ আমাদের উপর বৃ ষ্টিবর্ষণ করুন!!! লোকেরাও তাঁর সাথে হাত উঠিয়ে দুআ করলেন। [এসময় তিনি চাদর উল্টিয়েছেন কিম্বা কিবলামুখী হয়েছেন এরকম কথা বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়নি।] তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ আমরা আকাশে ছোট-বড় কোন ধরণের মেঘমালা দেখিনি। আমদের এবং সালা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ী-ঘরের উপর মেঘমালার কোন কিছুই ছিলনা। আকাশ ছিল কাঁচের মত পরিস্কার। তিনি বলেন, ধনুকের মত মেঘমালা পাহাড়ের পিছনে দেখা গেল। তা আকাশের মাঝমাঝি স্থানে পৌঁছেই ছড়িয়ে পড়ল এবং বৃ ষ্টিহতে লাগল। আল্লাহ্র শপথ বৃ ষ্টিবন্ধ হল না বরং মেঘমালা পাহাড়ের বিশাল আকার ধারণ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে

পড়ল। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করার পূর্বেই মুষল ধারায় বৃষ্টিবর্ষণ শুরু হল, আমি দেখলাম বৃষ্টির পানি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়ি মোবারক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন। আমরা পানি ভেঙ্গে বাড়ি পৌঁছলাম। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অধিক বৃষ্টির কারণে বাড়ী পৌঁছতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল।) সেই দিন, পরবর্তী দিন, তার পরবর্তী দিন এভাবে পরের জুমআ পর্যন্ত বিরামহীন বৃষ্টি হল, এমনকি মদীনায় বন্যা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। (অন্য বর্ণনায়, আল্লাহ্র শপথ আমরা ছয় দিন সূর্য দেখিনি।) পরবর্তী জুমআয় উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তি অথবা অন্য একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! -তিনি তখন খুতবা দিচ্ছিলেন- বৃষ্টির পানিতে তো ঘর-বাড়ি ধ্বসে পড়ল রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেল, মাল-সম্পদ ডুবে গেল, পশু-পাখি ধ্বংস হয়ে গেল। তাই বৃষ্টিবন্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকী হাঁসলেন। তারপর দুহাত উত্তোলন করে দুআ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বৃষ্টি

বর্ষণ করুন, ইব্বলপষ উভষ বুঁ হে আল্লাহ্! পাহাড়ের চুঁড়ায়, বধ্য ভুমিতে, ছোট ছোট টিলার উপর, উপত্যকায়, গাছ-পালায়। তিনি একদিকে ইঙ্গিত করতেই মেঘমালা সেদিকে সরে গেল এবং আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল। মদীনার চতুর্পার্শ্বে বৃষ্টি হতে থাকল। দেখে মনে হচ্ছিল মদীনা যেন একটি প্রশস্থ গর্ত। এক ফোটা পানিও মদীনায় পড়ল না। আমরা সূর্যের রোদের মধ্যে মসজিদ থেকে বের হলাম। আল্লাহ্ তাঁর নবীর কারামত দেখালেন এবং তাঁর দুআ কবুল করলেন। প্রায় একমাস উপত্যকা সমূহে পানি প্রবাহিত হতে থাকল। যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউই এল সবাই মুষলধারে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কথা বলতে থাকল।□ (সহীহ্ বুখারী)

এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল যে, সাহাবীরা (রাঃ) নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি যেন তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করেন এই আবেদন করেছেন। কিন্তু নবীজীর মৃত্যুরপর তাঁরা আর নবীজীর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন নি এবং তাঁর কাছে দুআরও আবেদন রাখেননি।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে দুর্ভিক্ষের সময় আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের দুআর মাধ্যমে বৃ ষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি দুআয় বলতেন, হে আল্লাহ্ আমরা ইতোপূর্বে আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে তোমার কাছে বৃ ষ্টি প্রার্থনা করতাম, তুমি আমাদেরকে বৃ ষ্টি প্রদান করতে। এখন আমাদের নবীর চাচা (আব্বাসের) মাধ্যমে বৃ ষ্টিপ্রার্থনা করছি, আপনি আমাদেরকে বৃ ষ্টি প্রদান করুন।' (সহীহ বুখারী)

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যেতাম, তাঁকে অনুরোধ করতাম দুআ করার জন্য। এখন তিনি মৃ ত্যু বরণ করেছেন, সুমহান বন্ধুর দরবারে চলে গেছেন। তিনি আমাদের জন্য দুআ করবেন এটা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা নবী ﷺএর চাচা আব্বাসের স্মরণাপন্ন হয়েছি, তাঁকে অনুরোধ করছি, তিনি আমাদের জন্য দুআ করবেন।[১]

---

[১] . দ্রঃ আত্তাওয়াস্সুল আন্ওয়াউহু ও আহ্কামুহু- আলবানী ৪৪ পৃঃ।

নেক লোকের উসীলা করা বৈধ হলে তো সাহাবীদের আব্বাস (রাঃ)এর কাছে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না। অথবা আগের হাদীছে অনাবৃষ্টির জন্যে লোকদের নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে দুআর আবেদন করারও দরকার ছিল না, নিজেরা ঘরে বসে নবীজীকে উসীলা করে দুআ করলেই হত। কিন্তু এরূপ প্রমাণ আমরা সাহাবীদের (রাঃ) আমল থেকে পাই না।

এজন্যে একজন মুমিন আরেক মুমিনের জন্যে সর্বোচ্চ যা করতে পারেন তা হচ্ছে তিনি তার জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। এই দুআ যে কেউ যে কারো জন্যে করতে পারে। কিন্তু একথা বলার অধিকার কারো নেই যে, আমি তোমাকে আল্লাহর কাছে মাফ করিয়ে দিব বা তাঁর দরবারে কবুল করিয়ে দিব। কেননা কাউকে মাফ করা না করা, কবুল করা না করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা কবুল করতে পারেন, যাকে ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। তাঁর উপর দাবী করার মত কারো কোন অধিকার নেই। কেননা ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা বুরূজঃ ১৬) ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ ﴾

﴿يُسْأَلُونَ﴾ তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু তারা যা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২৩)

অনুরূপভাবে একজন মানুষ কোন নেক ও পরহেজগার ব্যক্তির কাছে সর্বোচ্চ এই আশা করতে পারে যে, তিনি তার জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। সে ঐ নেক ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে তার আবেদন পেশ করবে তিনি যেন তার জন্যে দুআ করেন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিভিন্ন সময় বৃষ্টির জন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্যে নবী (সাঃ)এর কাছে গিয়ে দুআর আবেদন করতেন। কিন্তু ঐ নেক ব্যক্তির প্রতি এই বিশ্বাস করে বসে থাকবে না যে, তিনি দুআ করলেই আমার গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন বা আমার কাজ হয়ে যাবে। আমাকে আল্লাহর কাছে কিছুই বলতে হবে না; বরং সে নিজেও আল্লাহর কাছে দুআ করবে। আমরা জানি নবী (সাঃ) দুআ করলেই নিশ্চিতভাবে কবুল হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরও তিনি সাহাবীদেরকে তাঁর দুআর উপর ভরসা করে বসে থাকতে বলেননি। তিনি

আল্লাহর কাছে দুআ করে তাঁর গুনাহগার উম্মতকে কবুল করিয়ে নিবেন এরকম কোন আশা দেননি; বরং তিনি তাঁদেরকে আমলের তাগিদ দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্যে তাঁদেরকে শত শত দুআ শিখিয়েছেন। কোন্ আমল কোন্ সময় কিভাবে করলে গুনাহ মাফ হয় এরকম হাজারো আমলের বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষ প্রয়োজনে কেউ দুআর আবেদন করলে তার জন্যে তিনি দুআ করেছেন সেই সাথে কি বলে দুআ করতে হবে তাও তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ (مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ) যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুআ করে না, আল্লাহ তার উপর রাগ করেন।[১]

নেক লোকেরা যেমন অন্য মানুষের জন্যে দুআ করবেন, তাদের জন্যেও অন্যরা দুআ করবে। সাধারণ মানুষের যেমন আল্লাহর নৈকট্য দরকার। বাহ্যিকভাবে সমাজে পরিচিত ঈমানদার নেক ও সৎ লোকেরা জীবিত হলে তাদের যাবতীয় আমল কবুল

[১] . ইবনে মাজাহ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৮২৭ সিলসিলা সহীহা হা/২৬৫৪

হওয়ার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে, তাদের আমলে যেনওরিয়া প্রবেশ না করে, আত্মগরিমায় পতিত হয়ে যেন তাদের নেক আমল ধ্বংস না হয়ে যায় ইত্যাদির জন্যে অন্যের দুআর দরকার। তারা মৃ ত হলে তাদের মাগফিরাতের জন্যে, তাদের উপর করুণা বর্ষণ করার জন্যে, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্যে তারা জীবিতদের দুআর মুখাপেক্ষী থাকেন। এই কারণেই তো আমরা সাহাবায়ে কেরামের জন্য সর্বক্ষণ দুআ করি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম (আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) বলে। সাহাবায়ে কেরামও একজন অপরজনের নিকট দুআর আবেদন করতেন।[১]

---

[১] . তাবেঈ গুযাইফ বিন হারেছ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমি বালক ছিলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেনঃ বালকটি খুবই ভাল। তখন জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে উঠে এলেন অতঃপর বললেন, ভাতিজা! আমার জন্যে আল্লাহর কাছে কল্যাণের দু'আ কর। আমি বললাম, কিন্তু আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আবু যার্ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবী। একথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন, আপনিই তো আমার চাইতে বেশী উপযুক্ত; বরং আপনি আমার জন্যে দু'আ করবেন। তিনি বললেন, তা ঠিক আছে ভাতিজা। কিন্তু আমি একটু আগে শুনেছি ওমার (রাঃ) তোমার সম্পর্কে বলেছেন, ছেলেটা খুবই ভাল। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট শুনেছি, "নিশ্চয় ওমার যে কথা বলে আল্লাহ্ তার মধ্যে সত্য নিহিত রেখেছেন।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ঘটনাটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ফাযায়েলে সাহাবা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ১/৬ পৃঃ)

৪) পীরেরা কি গায়েবীভাবে মুরীদদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন?

চরমোনাই পীর মাওলানা এছহাক সাহেব হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেবের একটি কারামাত লিখেছেনঃ ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপঃ *দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামিম মাওলানা আহমদ হোছায়েন সাহেব হজ্জ থেকে ফেরার পথে তাদের ষ্টীমার সাগরের মধ্যে ভয়ানক তুফানের মধ্যে পতিত হয়। ষ্টীমার লাইন ছেড়ে ২০০ মাইল অন্য দিকে সরে যায়। তখন হাজী সাহেবগণ খুরমা, সুরমা, রুমাল ইত্যাদি মক্কা শরীফ থেকে যা নিয়ে এসেছিলেন তা*

উবাইদুল্লাহ্ বিন আবু সালেহ বলেনঃ একদা ত্বাউস (প্রখ্যাত তাবেঈ) আমার শুশ্রূষা করার জন্যে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি আমার জন্যে দু'আ করুন। তিনি বললেনঃ তুমি নিজে নিজের জন্যে দু'আ কর। কেননা কোন বিপদগ্রস্ত লোক যখন আল্লাহকে ডাকে তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন।"

ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেনঃ পূর্ব যুগের কিতাবে আমি পড়েছিঃ আল্লাহ্ বলেন, 'আমি আমার ইজ্জতের শপথ করে বলছিঃ যে ব্যক্তি আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, যদি আকাশ ও তার অধিবাসীরা এবং পৃথিবী ও তার অধিবাসীরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে আমি সেখান থেকে তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিব। আর যে ব্যক্তি আমাকে আঁকড়ে না থাকবে, আমি তার পায়ের নীচের মাটি দাবিয়ে তাকে ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাকে শুন্যে উড়িয়ে দিব অথবা তাকে তার নিজের উপর সোপর্দ করে দিব।' (তাফসীর ইবনে কাছীর ৬/২০৪ পৃঃ)

সামনে রেখে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন, ওগো আমার মাওলা! আমাদের প্রাণের টুকরা ছেলেমেয়ে আপনার নাবালেগ বেগুনাহ্ বান্দাদের জন্যই আমরা এইসব আনিয়াছি, তাহাদের উছীলায় আমরা গুনাহগার বান্দাদিগকে এই মহাসংকট হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

হযরত মাওলানা সাহেব (দেওবন্দের মোহতামিম) বলেন, *সে সময় আমার চোখে একটু তন্দ্রা আসিল। ঐ তন্দ্রার মধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, কুতুবে আলম হযরত গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে একখানা ছোট নৌকার উপর বসিয়া আমাদের ষ্টীমারখানা কাঁধের সঙ্গে লাগাইয়া ধরিয়ে রাখিয়াছেন। আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি হাজী সাহেবদের বলিলাম কোন চিন্তা নেই আমাদের বাঁচাইবার জন্যে আল্লাহ্ পাক মেহেরবানী করিয়া তাহার কুতুব পাঠাইয়া দিয়াছেন।*

পীর সাহেব ঘটনার সারাংশে লিখেছেনঃ *এখন লক্ষ্য করুন মাওলার খাঁটি আশেক হইতে পারিলে তিনি আপন আশেককে কতদূর মর্তবা ও কি পরিমাণ ক্ষমতা দান করিয়া থাকেন। আরো লক্ষ্য করুন যে, দুনিয়াতে যাহাকে এত শক্তি দান করিয়াছেন,*

আখেরাতে যে তাঁহাকে কত শক্তি, কত মর্তবা দিবেন তাহার কোন সীমা থাকিবে না। (আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহীঃ ৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

আরেকটি ঘটনাঃ

চরমোনাই পীর সাহেব হযরত গঙ্গুহী সাহবের আরেকটি কারামাত লিখেছেনঃ *জনৈক বৃদ্ধের এক ছেলে তিনদিন যাবত নিরুদ্দেশ ছিল। বৃদ্ধ ছেলেকে উদ্ধারের জন্য গঙ্গুহী সাহেবের নিকট দরখাস্ত করলেন। তখন গঙ্গুহী সাহেব মুরাকাবায় বসে বৃদ্ধের ছেলেকে উদ্ধার করে দিলেন এবং তাকে বললেন, বাড়ি যাও, তোমার ছেলে বাড়ি আসিয়াছে।*[১] (আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহীঃ ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা)

---

[১] . চরমোনাই পীর ঘটনাটি বিস্তারিত এরকম লিখেছেনঃ 'হযরত গঙ্গুহী (রহঃ) একদিন আপন বৈঠকখানায় বসিয়া খাছ লোকদিগকে ওয়াজ নছীহত শুনাইতেছেন। এমতাবস্থায় একজন বৃদ্ধ লোক আসিয়া বলিল, হুজুর আমার ছেলে তিনদিন যাবত কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে জানি না। বহু খোঁজ করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইতেছিনা। হুজুর! মেহেরবানী করিয়া আল্লাহ পাকের কাছে খাছ দোয়া করতঃ আমার ছেলেটিকে হাজির করিয়া দেন। এই বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল। কুতুবে আলম বৃদ্ধকে সান্তনা দিয়া মোরাকাবায় চলিয়া গেলেন। কিছু সময়ের মধ্যে তিনি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, বুড়ো! এখন তুমি বাড়ি যাও তোমার ছেলে বাড়ি আসিয়াছে। তখন বুড়ো খুব খুশি হইয়া বাড়ির দিকে দৌড় দিল। গিয়া দেখে, ছেলে তাহার বাড়ির দরজায় বেহুশ হইয়া পড়িয়া আছে। অনেক যত্নের ফলে খোদার রহমতে ছেলের হুশ হইল। খানা-পিনার বাদে তাহার বাবা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি কোথায় গিয়াছিলা? ছেলেটি বলিল, বাবাজান! আমি রাত্রে এশার নামায পড়িয়া বাহির হওয়া মাত্র একটি জ্বীন আমাকে ধরিয়া নিয়া

বিশ্লেষণঃ

উপরের ঘটনা দুটি দ্বারা যা বুঝে আসে তা নিম্নরূপঃ

ক) যে সকল বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে মারেফতের পীররা ভক্তদের সাহায্য করে থাকেন।

খ) কঠিন বিপদের মূহূর্তে দুআ করার জন্য উসীলা করার নিয়ম। আর তা হচ্ছে নেক লোকদের উসীলা করা।

গ) বিপদ-মুসীবতে পড়লে তা থেকে উদ্ধারের জন্য মারেফতের পীরদের কাছে আবেদন করা যায়।

ঘ) মারেফতের পীররা গায়েবীভাবে মুরীদদের বিপদের কথা শুনতে ও জানতে পারেন এবং

একটি সাগরের দ্বীপ চরে ফেলিয়া দেয়। ... সেখানে আমার তিনদিন কাটিয়া যায়। আমি জীবনের আশা ত্যাগ করতঃ বসিয়া কাঁদিতেছি। বেলা দশটার সময় হঠাৎ কুতুবে আলম গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলেন যে, হে ছেলে! তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? তুমি আমার সাথে চল, আমি তোমাকে বাড়ি দিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন। তারপর কি হইয়াছে তাহা আমি জানি না...।' (আশেক মা'শুক বা এস্কে এলাহীঃ ৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

যতদূরেই তারা থাক না কেন স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন।

ঙ) মারেফতের পীররা স্বশরীরে উপস্থিত না হয়েও গায়েবীভাবে মুরীদদের সাহায্য করতে পারেন।

চ) ওরা দুনিয়াতে যেমন মুরীদদের উপকার করেন, আখেরাতেও তাদের উপকার করবেন।

উপরের ঘটনা দুটি কোন্ দরবেশের মাধ্যমে ঘটেছে, আদৌ ঘটেছে কি না, ঘটনা সত্যা না মিথ্যা, ঘটলে কখন ঘটেছে ইত্যাদি বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা এবং যারা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উম্মত তাদেরকে নিয়ে। ইসলামী শরীয়তে এমন কোন উদাহরণ আছে কি যে মানুষ কোনভাবে শরীয়তের বাহ্যিক বিধি-নিষেধ থেকে দূরে থাকতে পারবে? এমন কোন সু্যোগ আছে কি যে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীছের সুস্পষ্ট লঙ্ঘণ কোন কাজ করেও মানুষ মুসলমান থাকতে পারবে? ইসলামের স্বর্ণ যুগে, ওহী নাযিল হওয়ার যুগে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে, তাবেঈদের যুগে

এরকম কোন নযীর আছে কি? যা আমরা উপরে দেখলাম?

নবী-রাসূল পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে মক্কার লোকদের কী নিয়ে ঝগড়া-বিসম্বাদ ছিল? ঐ সমস্ত লোকদের ঈমান-আমলই বা কী ছিল যে নবীজী তাদের সাথে মিশতে পারলেন না? আর তারাও তাঁকে সহ্য করল না? বেধে গেল বিশাল বিশাল যুদ্ধ ও হয়ে গেল রক্তপাত?

আমরা এ বিষয়ে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে মক্কার কাফেরগণ কিছু বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতো। বিশেষ করে যে সমস্ত কাজ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ করতে পারবে না, সে সকল বিষয়ে তারা আল্লাহর উপর নিখাদ দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। আমরা আরো দেখেছি যে, কাফেররা কোন কোন সময় তওয়াফ, হজ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতও করত। কিন্তু তারা যেহেতু উপকার-অপকারের ক্ষেত্রে মুর্তি ইত্যাদিকে উসীলা বা মাধ্যম বিশ্বাস করত। মনে করত যে ওরা তাদের

জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী এই কারণে তারা ছিল মুশরিক।[১]

কাফেররা বিপদে পড়লে শির্ক করত নাঃ

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে দেখা যায়, মক্কার কাফেররা কঠিন বিপদের মূহূর্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে ডেকেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের বিপদ দূর করে দিলে আবার তারা শির্ক শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ কঠিন বিপদের মূহূর্তে তারা পাকা ঈমানদার হয়ে যেত, বিপদ শেষ হলে ঈমান হারিয়ে ফেলত। আল্লাহ্ পাক কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে এরশাদ করেনঃ

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

তিনিই তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে পরিভ্রমণ করান; এমনকি তোমরা যখন নৌকায় বা জাহাজে অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলো যাত্রীদের

---

[১] . দেখুন ৭৪ থেকে ৭৯ পৃষ্ঠা।

নিয়ে অনুকূলে বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, এমন সময় হঠাৎ তাদের উপর এক প্রচন্ড প্রতিকূল ঝড় এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তরঙ্গমালা তাদের দিকে ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে তারা তো বিপদে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, হে আল্লাহ্! যদি আপনি আমাদের রক্ষা করেন, তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। অনন্তর যখনই আল্লাহ্ তাদের উদ্ধার করে নেন, তখনই তারা ভূ-পৃ ষ্ঠেঅন্যায়ভাবে বিদ্রোহচারণ করতে থাকে। (সূরা ইউনুসঃ ২২, ২৩)

বিপদের সময় কাফেরদের দুআ ও ইবাদতের একনিষ্ঠতার আরো বিবরণ আল্লাহ্ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾

সমুদ্রবক্ষে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবলমাত্র আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদের কথা তোমাদের মন থেকে সরে যায় (যেহেতু এই বিপদের মুহূর্তে ওরা এখন

কোন উপকারে আসবে না)। কিন্তু তিনি স্থলভাগে তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আসলে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৬৭)

অর্থাৎ- কাফেররা সর্বক্ষণ শির্ক ও কুফরীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাস এত দৃ ঢ় ছিল যে, যখন ঝড়-তুফানের মত কঠিন বিপদে পড়ত, তখন তারা তাদের মাবূদ মুর্তী পীর-দরবেশদের কথা বেমালুম ভুলে যেত। তারা পূর্ণরূপে জানত যাদেরকে তারা ডেকে থাকে তারা এই ভয়াবহ বিপদে কোন ধরণের সাহায্য বা বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করার ব্যাপারে খুবই নগন্য ও অত্যন্ত দূর্বল। বরং তারা তো তাদের ডাকই শুনতে পাবে না, সাড়া দেয়া তো দূরের কথা। এই কারণে তখন তারা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্যের আশা করত না আবেদন করত না। আর সাহায্য পাওয়ার আশায় এককভাবে খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকত। উদ্ধার পাওয়া পর্যন্ত তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত হয়ে যেত। তারা জানত যে এই কঠিন বিপদে আল্লাহ্ ছাড়া পৃ থিবীরকোন ব্যক্তি কোন শক্তি

তাদের উপকার করতে পারবে না, তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার পর তারা আবার আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত, তাঁর সাথে হঠকারী আচরণ শুরু করে দিত। পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী শির্ক ও কুফরীতে লিপ্ত হত- মনগড়া মাবূদদের উদ্দেশ্যে মান্নত করত, পশু যবেহ করত। নীচের আয়াতে তাদের সেই আচরণের বিবরণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

তারা যখন নৌযানে আরোহণ করত, তখন বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকত; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করতেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হত। (সূরা আনকাবূতঃ ৬৫)

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহঃ) বলেছেনঃ ওমুশরিকরা যখন সমুদ্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে জাহাজ বা স্টীমারে ভ্রমণ করত এবং কোন কারণ বশতঃ তা ডুবে যাওয়ার ভয় করত, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই দুআ করত। কঠিন বিপদের আশংকা করলে

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নিত, এককভাবে তাঁর আনুগত্য করত এবং তাঁর বাধ্যগত দাসে পরিণত হয়ে যেত। সে সময় তাদের মাবূদদের মাধ্যমে বা অন্য কারো মাধ্যমে উদ্ধার কামনা করত না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা আল্লাহ্ যখন তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতেন, তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দিতেন, তখন তারা আবার ইবাদতে শির্ক করা শুরু করত এবং আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবূদ ও মুর্তি, দেব-দেবীকে ডাকা শুরু করত।[১]

ইকরেমা বিন আবু জাহেল (রাঃ) বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে বিপদমুক্ত হওয়ার কারণেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আবু জাহেল পুত্র ইকরেমাকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। যদিও সে কাবার গেলাফ আঁকড়ে ধরে থাকে, তবু তাকে হত্যা করবে। এ সংবাদ পেয়ে ঈকরেমা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাকড়াও থেকে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন। লোহিত সাগর পাড়ি

[১] . তাফসীর ইবনে জারীর তাবারী ২০/৬০ পৃষ্ঠা

দিয়ে দূর দেশে কোথাও চলে যাবেন। জাহাজে আরোহণ করার পর তারা ঝড়ের কবলে পড়লেন। তখন জাহাজের লোকেরা বলল, সবাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাক, উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে দুআ কর। কেননা তোমাদের মাবূদ দেব-দেবী এখন কোন উপকার করতে পারবে না। একথা শুনে ইকরেমা বললেন, আল্লাহর শপথ সাগরের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউ যদি আমাকে বাঁচাতে না পারে, তবে তো স্থলভাগেও তিনি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তারপর তিনি দুআ করলেনঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে অঙ্গিকার করছি, আপনি যদি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেন, তবে আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমণ করব এবং তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করব। আমি অবশ্যই তাঁকে উদার-ক্ষমাশীল ও সম্মানিত পাব। অতঃপর ইকরেমা বিপদ মুক্ত হয়ে আর পলায়ন করেননি, মক্কায় ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[১]

---

[১] . সুনান নাসাঈ, অধ্যায়ঃ মুরতাদের বিধান হা/ ৩৯৯৯। হাদীছটি সহীহ, দেখুন সহীহ্ সুনান নাসাঈ- আলবানী হা/৪০৬৭, সিলসিলা সহীহা হা/১৭২৩)

সুবহানাল্লাহ্! কাফেররা বিপদের মুহূর্তে শির্কমুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ মনে আল্লাহকে ডাকত। কুরআনের স্বাক্ষ্য অনুযায়ী তারা সাময়িকের জন্যে হলেও হয়ে যেত তাওহীদপন্থী। উদ্ধারের জন্যে শুধুমাত্র তাঁর কাছেই ফরিয়াদ করত। কিন্তু আমরা পূর্বে উল্লেখিত ঘটনায় কী দেখলাম? ঝড়-তুফানে পথহারা জাহাজের যাত্রীরা কঠিন এই বিপদের মুহূর্তেও খাঁটিভাবে আল্লাহকে না ডেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে অন্য মানুষকে উসীলা হিসেবে পেশ করছে? আরেক দূর্বল মানুষের সাহায্যের অপেক্ষায় চোখ বুঁজে তার আগমণের অপেক্ষা করছে। এতবড় বিপদে পড়েও যদি মানুষ আল্লাহর দারস্থ না হয়, তাঁর কাছে কাকুতি মিনতী না করে তবে কখন তারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হবে। হায় আফসোস! মক্কার কাফেররা নৌকা-স্টীমারে বিপদের সময় তাদের পালনকর্তা আল্লাহকে চিনল, কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানরা ঠিক ঐ ধরণের বিপদে প্রকৃত উদ্ধারকারী আল্লাহকে চিনল না, চিনল কুতুব ও ওলী-আউলিয়াদেরকে! যারা অন্যের উপকার তো দূরের কথা নিজেরা নিজেদের উপকার সাধন বা ক্ষতি রোধের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা রাখেন না!

এ জন্যে বিশ্বের অন্যতম তাওহীদের অগ্রদূত, মুজাদ্দেদ শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহ:) উল্লেখ করেন, বর্তমান যুগের পীরপন্থী কবর পুজারীরা এত অধিক শির্ক চর্চা করে যে, তাদের শির্ক পূর্ব যুগে মক্কার কাফের-মুশরিকদের শির্ক থেকেও অনেক ভয়াবহ ও কঠিন। তিনি বলেন,

জেনে রাখুন! বর্তমান যুগের মুশরিকদের চেয়ে প্রথম যুগের মুশরিকদের শির্ক হালকা ছিল। কেননা আগের যুগের লোকেরা শুধু স্বছলতার সময় শির্ক করত। ফেরেশতা, ওলী-আউলিয়া ও দেব-দেবীদের ডাকত। কিন্তু কঠিন বিপদাপদের সময় শির্ক করত না। সে সময় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করত। যেমনটি কুরআনে সূরা বানী ইসরাঈলের ৬৭ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, সমুদ্র পথে তারা বিপদে পড়লে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, সকলকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছে রোনাজারী শুরু করে দিত। আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলে তারা আবার শির্কে লিপ্ত হয়ে যেত। এছাড়া সূরা আনআমের ৪০-৪১নং

আয়াত[১], সূরা যুমারের ৮নং আয়াত[২] এবং সূরা লোকমানের ২২ নং আয়াতে[৩] উক্ত কথা উল্লেখ আছে।

তিনি বলেন, আপনি যখন এ বিষয়টি বুঝলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যারা স্বচ্ছলতার সময় আল্লাহকেও ডাকত এবং অন্যকেও ডাকত। কিন্তু বিপদ-মুসীবতে একক আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ডাকত না, অন্য কারো স্মরণাপন্ন হত না; ভুলে যেত তাদের পীর-মাশায়েখ ও দেব-দেবীকে। তখন আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল বর্তমান যুগের

---

[১] . আল্লাহ বলেন, "আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, বলতো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয়, কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও? বরং সে সময় তোমরা তো কেবল তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে ডাকবে, ইচ্ছা করলে তিনি তা দূরও করে দেন। আর সে সময় যাদেরকে অংশী করতে তাদেরকে ভুলে যাবে।"

[২] . আল্লাহ্ বলেন, যখন মানুষ দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তখন সে একাগ্রচিত্তে শুধু তার পালনকর্তাকে ডেকে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সেই দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে যায়- পূর্বে যার জন্য সে আল্লাকে ডেকে ছিল এবং আল্লাহর শরীক স্থীর করে, যাতে করে অন্যকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে।"

[৩] . আল্লাহ্ বলেন, "যখন (সমুদ্র বক্ষে) মেঘমালা সদৃশ ঢেউ তাদেরকে আচ্ছাদিত করে, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে।"

লোকদের শিৰ্ক আর সেই যুগের লোকদের শির্কের মাঝে পার্থক্য।[1]

হানাফী মাযহাবের আলেম শায়খুল কুরআন শায়খ গোলাম (রহঃ) (মৃত্যু ১৯৮০ খৃঃ) বলেন: উল্লেখিত আয়াত সমূহ দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, মক্কার মুশরিকরা বিপদ-মুসীবতের সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো স্মরণাপন্ন হতো না। তারপরও তারা ছিল মুশরিক। কেননা তারা অন্য সময় গাইরুল্লাহর স্মরণাপন্ন হত। কিন্তু বর্তমান যুগের পীরপন্থীরা মক্কার মুশরিকদেরকে টেক্কা দিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা সধারণ সময়ে তো অবশ্যই এমনকি বিপদাপদের মুহূর্তেও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পীর-মাশায়েখ, কুতুবদেরকে ডেকে থাকে, তাদের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। বলেঃ আমাদের স্টীমার সমুদ্রে বিপদমুখ হয়েছে, হে আল্লাহর ওলী আমাদের সাহায্য করুন..।[2]

---

[1] . কাশফুশ শুবুহাত শরহে ইবনে উছাইমীন ১০২ পৃঃ।

[2] . জুহূদুল উলামা আল হানাফিয়্যাহ্ ফী ইবতালি আকায়েদিল কুবুরিয়্যা। (কবর পুজারী পীরপন্থীদের ভ্রান্ত আকীদা মূলৎপাটনে হানাফী আলেমদের প্রচেষ্টা- লেখকঃ ডঃ শামসুদ্দীন আফগানী (রহঃ) ২/১১৮৮ পৃঃ)

একটি প্রশ্নঃ আল্লাহ্ কি গঙ্গুহী সাহেবকে বান্দাদের উদ্ধারের জন্যে নিয়োগ দিয়ে রেখেছেন? কোথায় সেই নিয়োগপত্র, আমরা দেখতে পারি কি? যাতে করে আমরাও বিপদাপদে তাকে স্মরণ করে উদ্ধার পাই? আল্লাহ্ কি বান্দাদের সরাসরি হেফাযত করতে অপারগ তাই আরেকজনের তাঁর সাহায্যের দরকার? এই ঘটনা থেকে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, মানুষ যদি পীরদের প্রতি বিশ্বাস রাখে তবে বিপদাপদে তারা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবেন? তাহলে শির্ক কাকে বলে? আল্লাহর ক্ষমতাকে ভাগ করে নেয়ার দাবী করলেও যদি তা শির্ক না হয়, তবে শির্ক কী?

আফসোস! পীর সাহেবের এই সমস্ত লিখনীর মধ্যে যদি মানুষকে শির্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য আহবান করা হত, কতই না ভাল হত! কিন্তু শির্ক কি? কি কাজ করলে শির্ক হয় তার কোন বিবরণ তার বইয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম নয়ঃ

আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلا،أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার ধারণায় তাদেরকে ডেকে থাক, তারা তো তোমাদের বিপদাপদ দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং (তাতে সামান্যতম) পরিবর্তন করারও কোন শক্তি তাদের নেই। যাদেরকে তারা ডেকে থাকে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে বেড়ায় যে, তাদের মধ্যে কে কত আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে। তাঁরা আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় [illegible] (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৬-৫৭)

মানুষ যাতে মানুষ মুখী না হয়ে আল্লাহ মুখী হয়, বিপদাপদে শুধু আল্লাহরই স্মরণাপন্ন হয় এ জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে বিভিন্নভাবে উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষকেও সেই কথা শুনিয়ে দিতে আদেশ করেছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

আল্লাহ যদি আপনাকে কোন বিপদে ফেলেন, তবে তা থেকে তিনি ছাড়া উদ্ধার করার ক্ষমতা কেউ রাখে না। (সূরা আনআমঃ ১৭, ইউনুসঃ ১০৭)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا﴾

আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করবে? ওরা তো নিজেদেরই না উপকার করার ক্ষমতা রাখে না কোন ক্ষতি করার সামর্থ রাখে। (সূরা রাদঃ ১৬)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾

আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ যদি তোমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করে অথবা তোমাদের উপকার করার ইচ্ছা করেন, তবে কে আল্লাহর ইচ্ছাকে রুখে দেয়ার ক্ষমতা রাখে? (সূরা ফাতাহ্ : ১১)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾

ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাবূদ গ্রহণ করেছে। অথচ ঐ মাবূদরা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ওরা নিজেদের কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। কাউকে মৃত্যু দেয়া, জীবন দেয়া এবং কারো পুনরুত্থানের মালিক নয়।' (সূরা ফুরকানঃ ৩)

অতএব সাবধান হে মুসলিম! কোন পীর আপনার কোন কল্যাণ আনয়ন করতে পারবে না এবং আপনাকে কোন অকল্যাণ থেকে বাঁচাতেও পারবে না। এমনকি তিনি ঐ ক্ষেত্রে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে আপনার মধ্যস্থ হওয়ারও ক্ষমতা কিংবা যোগ্যতা কোনটাই রাখেন না। কারণ তিনি নিজেই আল্লাহর কল্যাণের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অকল্যাণ থেকে নিজে নিজে বেঁচে থাকতে অপারগ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ভাল-মন্দের মালিক ননঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার সূত্রে মানুষ যেন তাঁর

কাছে এমন কিছু কামনা না করে যাতে আল্লাহ্ ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই, তিনি নিজের কোন উপকার বা বা অপকার করার ক্ষমতা রাখেন না, একথা স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ বলে দিয়েছেনঃ

﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের আত্মার ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবী বিষয়ের খবর জানতাম তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। (অতএব আমি গায়েবের কোন খবরই রাখি না) আমি শুধু মুমিন সমপ্রদায়ের জন্যে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।॥ (সূরা আরাফঃ ১৮৮)[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি নিজ কল্যাণের মালিক হতেন বা নিজেকে অকল্যাণ

---

[১] . রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে নিজের আত্মার কোন ধরণের কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক নন একথা সূরা ইউনুসেও আছে। দেখুন ৪৯নং আয়াত।

বা বিপদ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতেন, তবে আল্লাহ্ তাকে সেই মালিকানা দিয়ে দিতেন এবং ফলে তিনি ইসলামী দাওয়াত-তাবলীগের ভয়ানক কন্টকাকীর্ণ পথে কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখিন হতেন না। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, তিনি তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কাফেরদের প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। তাঁর পবিত্র শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। উহুদের প্রান্তরে তাঁর দন্দন মোবারক শহীদ হয়েছে। ইহুদী মহিলা দাওয়াত করে তাঁকে বিষ মিশ্রিত গোস্ত খাইয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাঁকে অলৌকিক কোন ক্ষমতা দিয়ে থাকলে, তার বলে তিনি কাফেরদের পাথরকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। অথবা উহুদের প্রান্তরে কাফেরদের বর্শার আঘাত থেকে নিজের শরীরকে, মুখমন্ডল ও দন্দনকে রক্ষা করতে পারতেন। অথবা তিনি গায়েবের খবর জানলে ইহুদী মহিলার বিষ মিশ্রিত গোস্ত খেতেন না। রক্ষা করার এই বিষয়গুলো পুরাটাই একমাত্র আল্লাহর হাতে কারো হাতে নেই।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতেরও ভাল-মন্দের মালিক ননঃ

অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতেরও কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভাল-মন্দের মালিক নন। দুনিয়াবী কল্যাণ-অকল্যাণ তো অবশ্যই এমনকি কাউকে হেদায়াত বা গুমরাহ করার ক্ষমতাও তাঁর অধিকারে নেই। এসব কিছুর অধিকারী মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا﴾

আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কারো জন্যে কোন ধরণের অনিষ্টের এবং কল্যাণের মালিক নই। (সূরা জিনঃ ২১)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পিতৃব্য আবু তালেব নবীজীকে নানাভাবে আজীবন সহযোগিতা করেছেন। তাঁর জন্য নানান কষ্ট হাঁসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন। এমনকি তিনি নবীজিকে বিশ্বাসও করতেন। তিনি এটাও মানতেন যে, ইসলামই সত্য ধর্ম এবং মূর্তি মিথ্যা। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে তিনি আবু তালেবকে শত অনুরোধ করেও

কালেমা পাঠ করাতে পারেননি। তাকে হেদায়াত করতে পারেননি। কারণ তিনি হেদায়াতের মালিক নন। এজন্যে আল্লাহ্ তাঁকে কুরআন নাযিল করে আশ্বস্থ করেছেনঃ

﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

আপনি কাউকে ভালবাসলেই তাকে হেদায়াত করতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করতে পারেন। হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনি অধিক জ্ঞান রাখেন। (সূরাঃ কাসাসঃ ৫৬)

শায়খ আবদুর রহমান সাদী (রহঃ) বলেনঃ যারা উপকার পাওয়ার আশায় এবং বিপদ মুক্তির জন্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর স্মরণাপন্ন হয় এই আয়াত সমূহ তাদের মূর্খতাকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাতে কোন কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ যার কল্যাণ করবেন না, তিনি তার কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারবেন না। আল্লাহ যার বিপদ দূর করবেন না, তিনি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। আল্লাহ্ পাক তাঁকে যা শিখিয়েছেন বা জানিয়েছেন তা ব্যতীত তিনি অতিরিক্ত কিছুই

জানেন না। তিনি মানব জাতির যে উপকার করতে পারেন তা হচ্ছে তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। সৎ আমল করলে জান্নাত অসৎ আমল করলে জাহান্নাম। তাঁর পক্ষ থেকে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার মানুষের জন্যে। এ উপকার পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধবের সকল উপকারের চাইতে অধিক ও শ্রেষ্ঠ। কেননা তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে যাবতীয় কল্যাণের রাস্তা দেখিয়েছেন এবং প্রত্যেক ক্ষতি ও অকল্যাণের বিষয় থেকে সতর্ক করেছেন। আর এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়ে গেছেন।[১]

আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুতার যুদ্ধে সাহাবীদেরকে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে সাহাবীগণ ভীষণ বিপদের সম্মুখিন হয়েছিলেন। তাঁদের সেনাপতিগণ একে একে শহীদ হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী সাইয়্যেদুল মুরসালীনের কাছ থেকে সাহায্যের কোন আশা করেননি, তাঁরা একবারও ভাবেননি যে, আমাদের সাথে আছেন দোজাহানের মুক্তি দূত, তিনি

[১] . তাফসীরে সা'দী ১/৩১১

আমাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবেন। আর আল্লাহ্ তাআলাও নবীজীকে গায়েবীভাবে তাদের সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করেননি। সাহাবীগণ এক আল্লাহর উপর ভরসা করে শুধুমাত্র তাঁর নিকট থেকেই সাহায্যের আশায় যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ই তাদেরকে সাহায্য করেছেন। দান করেছেন বিশাল বিজয়।

উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রাঃ)এর চরিত্র নিয়ে মুনাফেকরা কটুক্তি করেছিল। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে পেরেশানের হালতে দিন কাটাচ্ছিলেন। এমনকি তিনি আয়েশা (রাঃ)কে তাওবা করারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ওদিকে আয়েশা (রাঃ) দুঃশ্চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে গেছিলেন। প্রায় একমাস অস্থিরতার সাথে তাঁদের দিন কেটেছে। তারপরও নবীজী গায়েবী জ্ঞানের জোরে দাবী করতে পারেননি যে, আয়েশা (রাঃ) সত্য- মুনাফেকরা মিথ্যুক। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ ওহী নাযিল করে তাঁদের চিন্তা মুক্ত করেন। চিরসত্যবাদী আবু বকর (রাঃ) এর

চিরসত্যবাদীনী কন্যা মা আয়েশা (রাঃ)কে কুরআনের আয়াত নাযিল করে পুতপবিত্র ঘোষণা করেন।[১]

অতএব গঙ্গুহী সাহেবের মাধ্যমে নয়; বরং আল্লাহর বিশেষ রহমতে হাজী সাহেবদের জাহাজ পথ খুঁজে পেয়েছে। যিনি মহান একক ক্ষমতাবান। যিনি মানুষকে জলে ও স্থলে ভ্রমণ করান। সেই আল্লাহই তাদেরকে রক্ষা করেছেন, উদ্ধার করেছেন। কেননা তিনিই তাদের সাথে ছিলেন এবং সকলের সাথে থাকেন। কোন নবী বা ওলী বা পীর মানুষের সাথে থাকেন না। মানুষের ভাল-মন্দ বিষয় প্রত্যক্ষ করেন না। আল্লাহ্ তাদেরকে ডুবিয়ে মারলে হাজার গঙ্গুহী, হাজার পীর, হাজার গাউছ, হাজার কুতুব একত্রিত হয়েও কোন উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ،إلا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾

আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। সে অবস্থায় তারা সাহায্য করার জন্যে আর্তনাদ শ্রবণকারী কাউকে পাবে না এবং তারা

[১] . সূরা নূর ১১ থেকে ২৬ নং আয়াত। ঘটনাটি সহীহ্ মুসলিমে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

পরিত্রাণও লাভ করবে না। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং তাদেরকে কিছুকাল জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেয়ার জন্যে আমি তাদেরকে ডুবিয়ে মারি না।” (সূরা ইয়াসীনঃ ৪৩, ৪৪)

কেননা গঙ্গুহী সাহেবকে আল্লাহ্ জাহাজ রক্ষা বা এরকম কোন বিপদ থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব প্রদান করেননি। সারা জীবন ধরে তাকে ডাকলে বা তার কাছ থেকে সাহায্যের আশা করলে, সামান্যতম উপকার তো দূরের কথা তিনি মানুষের ডাকই শুনতে পাবেন না। কোন্ মানুষ কি অবস্থায় আছে তা তিনি জানতেই পারবেন না। অতএব-

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾

“তার চাইতে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে আহ্বান করে যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না এবং সে তাদের আহ্বান সম্বন্ধে কোন কিছু অবহিতও নয়।” (সূরা আহ্কাফঃ ৫)

সুতরাং গঙ্গুহী বা এরকম কোন পীরের উপর এধরণের বিশ্বাস আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য শির্ক এবং

তাঁর উপর অনেক বড় অপবাদ। যার পক্ষে আল্লাহ্ কোন দলীল নাযিল করেননি। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾

ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে যে তার কাছে নির্দেশনা এসেছে অথচ তার কাছে কোনই নির্দেশনা আসে নি।‫ (সূরা আনআমঃ ৯৩)

এই শির্ক আল্লাহ্ কখনই ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর চাইতে নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।‫ (সূরা নিসাঃ ৪৮ ও ১১৬)

এধরণের শির্ক নিয়ে মৃ ত্যুবরণ করলে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে

দিয়েছেন। তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (সূরা মায়েদাঃ ৭২)

একটি প্রশ্নঃ আমাদের দেশে তো প্রায়ই লঞ্চ-স্টীমার ডুবীর খবর শোনা যায়, কই একবারও তো আমাদের মুহতারাম পীর সাহেব বা তার খলীফারা তা উদ্ধার করলেন না? প্রায় রেডিও-টিভি ও পত্রিকায় নিখোঁজ সংবাদ শোনা যায়, আমাদের হুজুরেরা তো তাদেরকে উদ্ধার করে দেন না। নাকি এই হুজুরেরা গঙ্গুহী হুজুরদের মর্তবায় উন্নীত হতে পারেননি, তাদের মত মোরাকাবা করতে শিখেননি এবং তাদের মত ক্ষমতা লাভ করেননি? অথবা নাকি তাদের মুরীদরা দেওবন্দের মোহতামিমের মত হুজুরের উপর মজবুত বিশ্বাসের অধিকারী হতে পারেননি, যার কারণে গঙ্গুহী বা মাওলানা এছহাক বা তার পীর মাওলানা ইবরাহীম একবারও উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে আসেন না, ফলে বারবার এরকম লঞ্চ-ষ্টীমার ডুবীর খবর পাওয়া যায়? মুরীদরা যদিও হুজুরদের উপর পাকা ঈমানের অধিকারী নাও হন তবুও তো হুজুরদের উচিত ছিল

তাদের ঈমানকে পাকা করার জন্যে গঙ্গুহী হুজুরের কারামতের কিঞ্চিত হলেও বাংলার দূর্বল মানুষদের সামনে জাহির করা। নাকী শুধু উনাদের কারামতী তাদের মুরীদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? বিপদে পড়েল মুরীদরা ঠিকই পীরদের উসীলায় উদ্ধার পেয়ে যান। কিন্তু যারা মুরীদ নয় তারাও মুরীদ না হওয়ার অপরাধে পীর সাহেবদের দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে মাহরূম থেকে যায়?

যদি মাওলানা এছহাক বা তার খলীফারা গঙ্গুহী বা শামসুত্ তাবরিজী হুজুরদের মত ক্ষমতা না পেয়ে থাকেন, তবে তো তাদের কাছে বায়আত করে লাভ নেই। অতএব উনারা ঐ ধরণের ক্ষমতা আগে লাভ করুন, তারপর আমরা সবাই গিয়ে তাদের কাছে বায়আত হব, দিল পরিশুদ্ধ করে তাদের শিখানো তরীকায় রাত-দিন সাধনা করব, যিকির ও ওজীফা পাঠ করব। তখন আর বাংলাদেশে কোন মুসীবত আসবে না, কোন সিডর, জলোচ্ছাস, বন্যা হানা দিয়ে মুরীদদেরকে ধ্বংস করে দিবে না, কারো সন্তান নিখোঁজ হবে না, কারো কোন সমস্যা থাকবে না।

আরেকটি ঘটনাঃ

চরমোনাই পীর সাহেব আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেনঃ *হযরত শামছুত তাবরিজী (রঃ) একদা রোম শহরের দিকে রাওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে জনৈক অন্ধ বৃদ্ধকে একটি লাশ সম্মুখে নিয়া কাঁদিতে দেখলেন। কারণ জিজ্ঞেস করিলে বৃদ্ধ বলিল, আমার কেউ নেই, ১২ বছর বয়স্ক এটা আমার নাতী গাভী পালিয়া আমাকে দুগ্ধ খাওয়াইত এবং আমার খেদমত করিত। এখন আমার কোন উপায় নাই তাই কাঁদিতেছি। তখন হুজুর (তাবরিজী) বলিলেন, হে ছেলে, তুমি আমার হুকুমে দাঁড়াও। তখনই ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কিরূপে জীবিত হইলে? নাতি বলিল, আল্লাহর ওলী আমাকে জেন্দা করিয়াছেন। এখবর খাঁটি মুসলমান বাদশার কাছে পৌঁছিলে তিনি কুতুবকে ডেকে বললেনঃ যদি আল্লাহর আদেশে জেন্দা হইতে বলিতেন। কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন, মাবুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব- তাঁহার আন্দাজ নাই? এই বৃদ্ধের একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নিয়াছে। বাকী ছিল এই নাতিটি, যে গাভী পালন*

করিয়া কোনরূপে জিন্দেগী গুজরান করিত, এখন এটিও নিয়া গেল। তাই আমি আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে জোরপূর্বক রূহ নিয়া আসিয়াছি...।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়ঃ

বাদশাহ্ তাবরিজী সাহেবকে বলিলেন, আপনি শরীয়ত মানেন কিনা? তিনি বলিলেনঃ নিশ্চয়, শরীয়ত না মানিলে ভীষণ কিয়ামতের দিন হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত পাওয়া যাইবেনা। বাদশা বলিলেন, আপনি শেরেক করিয়াছেন, সেই অপরাধে আপনার শরীরের সমস্ত চামড়া খসাইয়া ফেলিতে হইবে। আল্লাহর কুতুব কথা শুনা মাত্র দুই হাতের আঙ্গুলি দ্বারা পায়ের নীচ থেকে আরম্ভ করিয়া গায়ের সমস্ত চামড়া খসাইয়া বাদশাহর সম্মুখে ফেলিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহর জেকেরে মশগুল হইয়া গেলেন। ভোর বেলা সূর্যের তাপ চর্মহীন শরীরে লাগা মাত্র কষ্ট পাইলেন এবং সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সূর্য্য আমি শরীয়ত মানিয়াছি, কাজেই তুমি আমাকে কষ্ট দিওনা। ইহা বলা মাত্র ঐ দেশের জন্য সূর্য্য অন্ধকার হইয়া গেল। দেশের ভিতর একটা সোরগোল পড়িয়া

গেল। বাদশাহ্ অস্থির হইয়া ঐ হুজুরকে তালাশ করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর এক জঙ্গলে গিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন এবং আরজ করিলেন হুজুর শরীয়ত জারী করিতে গিয়া আমরা কি অন্যায় করিলাম, যাহার জন্য আমাদের এই মুসীবত আনিয়া দিয়াছেন? হুজুর তখন সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সূর্য্য তোমাকে বলিয়াছি আমাকে কষ্ট দিওনা, কিন্ত দেশবাসীকে কষ্ট দেও কেন? ইহা বলা মাত্র সূর্য্য আলোকিত হইয়া গেল। আল্লাহ্ পাক তাহার ওলীর শরীর ভাল করিয়া দিলেন।

চরমোনাই পীর সাহেব উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে টিকায় লিখেছেনঃ

এধরনের কথা বলা আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য পরিস্কার কুফুরি বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের দেওয়ানা বান্দাগণ এশ্কের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য হারাইয়া একপ্রকার বেহুশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন। আল্লাহ্ পাকের আশেকদের এধরনের উক্তি এশকের জোশ বশতঃ ঘটিয়া যায়, তাই আল্লাহ্ পাকের নিকট তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়না। যেরূপ শিশু যদি পিতার মুখে থাপ্পড়

মারে কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তাহা পীড়াদায়ক হয়না বরং তাহাতে আরো মহব্বতের জোয়ার উঠে। [দ্রঃ ভেদে মা'রেফত বা ইয়াদে খোদাঃ ১৫-১৭ নং পৃ ষ্ঠা]

বিশ্লেষণঃ

সম্মানিত পাঠক! আগের ঘটনা দুটিতে যে শির্ক ও কুফরীর বিষয় উল্লেখ হয়েছে এই ঘটনায় তা আরো প্রকট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সনদ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ বিহীন এ ধরণের মিথ্যা, উদ্ভট, কল্পনা প্রসূত ও বিবেক বর্জিত ঘটনা উল্লেখ করে সরলমনা মানুষের ঈমান লুট করার উদ্দেশ্য কি তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর তা হচ্ছে সুমহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীরদের ছায়া তলে আশ্রয় নেয়ার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানানো। যেহেতু তাদের সাথে আল্লাহর হট লাইন আছে, চুক্তি আছে, ক্ষমতা ভাগাভাগি আছে, তাই আল্লাহর কাছে অত দূর না গিয়ে নিজের পীরের কাছে গেলেই তো সব কাজ হয়ে যাবে। পীরের হাতে নিজেকে সঁপে দিলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে, কেউ নিখোঁজ হলে তাকে ফেরত পাওয়া যাবে, সন্তান

পাওয়া যাবে, ব্যবসায় লাভবান হওয়া যাবে, শত্রু পরাজিত হবে, মামলায় জেতা যাবে, এমনকি মৃতকেও জীবিত করে পাওয়া যাবে। সুতরাং আর চিন্তা কিসের?

তাবরিজীর ঘটনা থেকে আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাই তা নিম্নরূপঃ

ক) মারেফতের পীররা মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন! এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর অনুমতির তোয়াক্কা করেন না।

কিন্তু ইসলাম কী বলে? মানুষকে জীবন দেয়া ও মৃত্যু দেয়া একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তিনিই জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।[১] এ কাজে তিনি কাউকে অংশীদার করেননি। নবী-রাসূলদের (আঃ) মো'জেযা স্বরূপ কতিপয় ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে তাঁদের মাধ্যমে মৃত জীবিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সবই ছিল তাঁদের নবুওতকে প্রমাণ করার জন্যে মো'জেযা স্বরূপ। শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তা সম্ভব হয়েছে।[২]

---

[১] . দ্রঃ সূরা মুলকঃ ২ নং আয়াত।

[২] . যেমন ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতেন। আল্লাহ্‌ বলেন, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেন, “আল্লাহর হুকুমে আমি মৃতকে জীবিত করি।” (সূরা আলে ঈমরানঃ ৪৯) আল্লাহ্‌ তা’আলাও ঈসা (আঃ)কে সে কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, وَإِذْ

কিন্তু ঐ নবীগণ (আঃ) আল্লাহর এত প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও কখনো এরূপ বলেননিঃ *তুমি আমার হুকুমে জেন্দা হও।* অথবা তারা কখনো আল্লাহর নিকট থেকে রূহ ছিনিয়ে নিয়ে আসার স্পর্ধা দেখাননি। কেননা তাঁরা সবাই আল্লাহর নির্দেশে চলতেন। তার নির্দেশের বাইরে কখনো চলতেন না। তাবরীজি সাহেব যদি আল্লাহর নির্দেশে চলতেন বা তার কাছে তাওহীদ থাকত, তবে মহান মালিকের অনুমতি নিয়েই রূহ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতেন। একক ক্ষমতাবান আল্লাহর কাছে আবেদন করতেন। যেহেতু তিনি নিজের হুকুমে মৃতকে জেন্দা করেছেন এবং জোর করে রূহ নিয়ে এসেছেন, সেহেতু আমরা নিশ্চিত যে, (যদি এ ঘটনা সত্য হয় তবে) আল্লাহর কাছ থেকে নয়; বরং শয়তানের কাছে সাহায্য নিয়েছেন। অর্থাৎ শয়তান ঐ ছেলের আকৃতি ধারণ করে বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। যার কারণে ঐ ছেলের মুখ দিয়ে বের হয়েছে যে, *আল্লাহর ওলী আমাকে জেন্দা করিয়াছে।*

تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي "তুমি যখন আমার নির্দেশে মৃতকে জীবিত করতে।" (সূরা মায়েদাঃ ১১০)

আমরা জানি কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল বের হবে সে মানুষের কাছে গিয়ে তাদের মৃত বাবা-মাকে জীবিত করে দিবে। তখন মানুষ দাজ্জালের উপর ঈমান আনবে। একজন জিন শয়তান তার বাবার আকৃতী ধারণ করবে আরেকজন জিন শয়তান তার মায়ের আকৃতী ধারণ করবে আর তারা বলবে ইনি (দাজ্জাল) তোমাদের রব। তোমাদেরকে একথা বলে দেয়ার জন্যে তিনিই আমাদেরকে জেন্দা করেছেন।[১]

অতএব তাবরিজী সাহেব কোন মানুষকে জেন্দা করেছেন এরূপ বিশ্বাস করা তাওহীদ বিরোধী সুস্পষ্ট কুফরী এবং শির্ক। যা থেকে তাওবা করা আবশ্যক।

আমার মনে হয় এই পীর সাহেব যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে থাকতেন,

---

[১] . রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ)

দাজ্জালের ফিতনা হচ্ছেঃ সে জনৈক গ্রাম্য লোককে বলবে, তুমি কি মনে কর আমি তোমার বাবা-মাকে যদি জীবিত করে দেই, তবে কি আমাকে রব বলে মানবে? সে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন দু'জন শয়তান তার বাবা-মার আকৃতি ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হবে, অতঃপর বলবে, বৎস! একে মেনে চল, ইনি তোমার পালনকর্তা।" (আবু উমামা বাহেলী থেকে ইবনে মাজাহ্ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি ছহীহ্, দ্রঃ সহীহ ইবনে মাজাহ হা/৪০৭৭, ছহীহুল জামে হা/১৩৮৩৩)

তবে মানুষ তার কাছেই ছুটে যেত। কারণ তার কাছে গিয়ে আবেদন করলে মৃত সন্তানকে জীবিত করে পাওয়া যায়। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে কাজ করে দিতেন না, তিনি আল্লাহর ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার দুঃসাহস করতেন না; বরং তিনি মানুষকে সবরের উপদেশ দিতেন।

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾

অতঃপর সেই সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপদেশ প্রদান করেছে। (সূরা বালাদঃ ১৭)

এরকমই একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে ঘটেছিল। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন জনৈক মহিলা একটা কবরের কাছে বসে ক্রন্দন করছে। তিনি তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে অভিযোগ করল যে, আমার বাচ্চাটি মারা গেছে তাই তার শোকে

কাঁদছি। নবীজী তাকে বললেনঃ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।□ অর্থাৎ এখানে কাঁদার কি আছে অথবা আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার কী আছে? তিনি তো বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না। যাতে বান্দার কল্যাণ আছে তিনি তাই করে থাকেন। জীবন-মৃ ত্যু যেহেতু আল্লাহরই হাতে সুতরাং এতে আফসোসের কিছু নেই; বরং তুমি সবর কর, তবেই আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন এবং এই দুঃখে প্রতিদান দিবেন। তখন মহিলাটি বলল, আপনি আমার থেকে দূরে যান। এই সন্তান মারা যাওয়াতে আমার কত বিপদ তা আপনি কি বুঝবেন? মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে চিনতে পারেনি। নবীজী চলে গেলে মহিলাকে বলা হল, তুমি জান কার সাথে কথা বলছিলে? তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। একথা শুনে মহিলাটি লজ্জিত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কেননা নবীজীর সাথে বেয়াদবী মূলক আচরণ করেছে। তাই সে তাঁর বাড়ীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল। দরজায় কোন দারোয়ান পেল না। তারপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আসলে আপনাকে চিনতে পারিনি। তখন

তিনি বললেনঃ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ প্রকৃত সবর হচ্ছে ওটাই যা প্রথম চোটে হয়ে থাকে। অর্থাৎ- বিপদ ঘটে যাওয়ার প্রথম ধাক্কাতেই যদি সবর করা হয় তবে তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে অফুরন্ত ছোয়াব পাওয়া যাবে। হায়-হুতাশ ও চিৎকার করে কান্নাকাটি করার পর সবর করলে ওটাকে সবর বলে না। (হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বুখারী ও মুসলিম)

অতএব তাবরিজী সাহেবের উচিত ছিল বৃদ্ধকে সবরের উপদেশ দেয়া, আল্লাহর ফায়সালায় মনক্ষুন্ন না হয়ে সবর করে তাঁর কাছে নিজেকে সোপর্দ করা, তাঁর কাছে এর প্রতিদান কামনা করা। মুমিনের যেখানে কল্যাণ আছে আল্লাহ্ সেটাই ফায়সালা করেন। তিনি কারো প্রতি যুলুম করেন না। তাঁর ফায়সালা মেনে নেয়াতেই মুমিনের ইহ-পরকালে সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য নিহিত আছে।

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যখন কোন বান্দার সন্তানের জান কবজ করা হয় তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করে নিয়েছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ।

আল্লাহ্ আবার বলেনঃ তোমরা আমার বান্দার হৃদয়ের টুকরার রূহ কবজ করে নিয়েছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, এত বড় মুসীবতে আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতারা বলেন, সে আপনার (ফায়সালা মেনে নিয়েছে, আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়নি; বরং আপনার) প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ্ ... পড়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ আমার বান্দার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করে দাও, আর তার নাম রাখ বায়তুল হাম্‌দ বা প্রশংসার ঘর।[১]

প্রিয় পাঠক! আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এই তাবরিজী সাহেব এবং তার দলের মারেফত পন্থীরা যদি সত্যিকার আল্লাহ্ প্রেমী ও প্রিয় নবীর খাঁটি অনুসারী হতেন, তবে আল্লাহর বন্ধু মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর তরীকায় নিজেদেরকে পরিচালিত করতেন। মানুষ বিপদে পড়লে তাদেরকে সবরের উপদেশ দিয়ে বড়জোর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। কখনো আল্লাহর সাথে বেয়াদবী মূলক আচরণ করতেন না বা তাদের অনুসারীরা ঐ অসৌজন্য মূলক অবৈধ

[১] . তিরমিযী, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ সিলসিলা সহীহা হা/১৪০৮।

(কুফরী) কথাকে বৈধ করার জন্যে অপব্যাখ্যা করতেন না। অতএব মারেফতের নাম করে তাদের আল্লাহ্ প্রেমের দাবী ও নবী প্রেমের মহড়া যে নিছক ভন্ডামী ও মানুষকে ধোকা দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তা আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। আল্লাহ্ সত্যই বলেছেনঃ

﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

ওরা যদি সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্, নবী এবং তাঁর নিকট যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেক লোকই ফাসেক।" (সূরা মায়েদাঃ ৮১)

খ) সূর্য-চন্দ্র মারেফতী পীরদের কথা শুনে থাকে!

তাবরিজী সাহেবকে কষ্ট না দেয়ার জন্যে সূর্য অন্ধকার হয়ে গেল, আবার তার হাতের ইশারায় আলো দিতে লাগল, এটিও একটি জঘণ্য মিথ্যাচারিতা। যার কোন সূত্র ও প্রমাণ নেই। আর তা বিশ্বাস করা এবং বর্ণনা করাও সুস্পষ্ট কুফরী। কারণ

সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি আল্লাহর আজ্ঞাবহ, কোন মানুষের আজ্ঞাবহ নয়। এগুলো আল্লাহর বড় বড় নিদর্শন। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾

এবং তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে- দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র।" (সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ্ : ৩৭)

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾

তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, কিভাবে আল্লাহ্ সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। এবং সেখানে চন্দ্রকে করেছেন আলো স্বরূপ ও এবং সূর্যকে করেছেন প্রদীপ স্বরূপ।" (সূরা নূহঃ ১৬-১৭)

সূর্য-চন্দ্রসহ পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহকে সিজদা করে থাকে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾

আপনি কি দেখেন না, আকাশ সমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহকে সিজদা করে, আল্লাহকে আরো সিজদা

করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়, বৃ ক্ষ প্রাণীকুল এবং অনেক মানুষ..।" (সূরা হাজ্জঃ ১৮)

এই সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র আল্লাহর নির্দেশে চলে। আল্লাহর নির্দেশেই তাদের গতি থেমে যাবে, তাদের আলো নিভে যাবে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾

যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে...।" (সূরা তাকভীরঃ ১-২) সন্দেহ নেই যে কিয়ামতের সময়ই চন্দ্র-সূর্যের এই অবস্থা হবে, তার পূর্বে নয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾

সে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন হবে? যখন দৃ ষ্টি চমকে উঠবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, পালানোর জায়গা কোথায়? (সূরা কিয়ামাহ্ : ৬-১০)

অতএব সূর্যকে আদেশ-নিষেধ করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই এবং এরূপ দাবী কেউ করলে নিঃসন্দেহে তা কুফরী বলে গণ্য হবে। আমাদের বুঝে আসে না চরমোনাই পীর সাহেব কিভাবে এই কুফরী কথা নিজের পুস্তকে উল্লেখ করে এরকম একটি

সুস্পষ্ট গোমরাহী মূলক কথাকে বৈধতা দেয়ার জন্যে সাফাই গাইলেন! আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাওহীদের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং সেই পথে পরিচালিত করুন।

গ) মারেফতের পীরগণ বাহ্যিকভাবে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান মানতে বাধ্য নন!

ঘ) আল্লাহর শানে বেয়াদবী মূলক কথা মুখে উচ্চারণ করলেও মারেফতের পীরদের কোন অপরাধ নেই!

আল্লাহর বান্দারা সবাই এক সমান। সবাইকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। শুধুমাত্র তিন শ্রেণীর মানুষের উপর থেকে হিসাবের কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে। তাছাড়া সকলেই বাহ্যিকভাবে ও আভ্যন্তরীন ভাবে ইসলামী শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানতে বাধ্য। উক্ত তিন শ্রেণী হচ্ছেঃ শিশু যতদিন না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, পাগল- যতক্ষণ না তার সুস্থ বিবেক ফিরে আসে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি- যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়।[১]

---

[১] . আলী (রাঃ) থেকে আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

চরমোনাই পীর মাওলানা এছহাক সাহেবের কথা অনুযায়ী শামসুত্ তাবরিজী সাহেব পাগল ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ *আল্লাহ্ পাকের দেওয়ানা বান্দাগণ এশ্‌কের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য হারাইয়া একপ্রকার বেহুশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন।... তাই আল্লাহ্ পাকের নিকট তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়না।* তাহলে তো পাগলের উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ প্রজোয্য হয় না। পীর সাহেব স্বীকার করেছেন যে, *এধরনের কথা বলা আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য পরিস্কার কুফরি বলিয়া গণ্য হইবে।* তাই পাগল বা বেহুশের মুখ থেকে শির্কী-কুফরী কথা, আল্লাহর শানে বেয়াদবী মূলক কথা বের হলে বা যে কোন কাজ করলে তাতে অপরাধ হবে না। তার জন্য কলম ধরা হবে না- তার কোন গুনাহ লেখা হবে না। অতএব কিভাবে বাদশাহ্ শরীয়তের দোহাই দিয়ে বললেন, *আপনি শেরেক করিয়াছেন, সেই অপরাধে আপনার শরীরের সমস্ত চামড়া খসাইয়া ফেলিতে হইবে?* অথচ বাদশাহ্ মূর্খ ছিলেন না। চরমোনাই পীর সাহেবের উক্তি মতে বাদশা ছিলেন *খাঁটি মুসলমান।* পীর সাহেবের কথামতে আল্লাহ্

পাকের নিকট অপরাধ বলে গণ্য না হওয়ার পরও কিভাবে বাদশাহ তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন? আর তাবরিজী সাহেবও বাদশার কথার প্রতিবাদ না করে শরীয়ত মেনে নিয়ে বিবেক বর্জিত কাল্পনিক হাস্যকর একটি কাজ করলেন- নিজের শরীরের চামড়া নিজে খুলে দিয়ে দিলেন? এথেকেই বুঝা যায় তিনি পাগল ছিলেন না- সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

আসলে (চরমোনাই) পীর সাহেব বুঝাতে চেয়েছেন যে, শরীয়ত ও মারেফত দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। শরীয়তী ধর্মে যা অপরাধ মারেফতী ধর্মে তা অপরাধ নয়। অর্থাৎ মারেফতী মতে উনি (তাবরিজী সাহেব) কোন অপরাধ করেননি কিন্তু শরীয়তী মতে অপরাধ করেছেন।

তাহলে প্রশ্ন উঠেঃ আল্লাহর কাছে কি নিয়ম দুরকম? তাঁর নিকট যা অপরাধ বলে গণ্য নয় শরীয়তে মুহাম্মাদীতে তা অপরাধ বলে গণ্য? কি আশ্চর্য সংঘর্ষময় কথা? তাহলে কি শরীয়তে মুহাম্মাদী যালেম-অত্যাচারী? নিরাপরাধকেও শাস্তি দেয়? নাকী এই শরীয়ত অন্য আল্লাহ্ থেকে এসেছে? (নাউযুবিল্লাহ্) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)এর শরীয়ত তাহলে আল্লাহর ওলীদেরকে চেনে না, তাদেরকে সম্মান দিতে জানে না? ইহুদী-খৃষ্টানকাফের-মুশরেকরা এঘটনা পড়ে কি বলবে না যে, মুহাম্মাদের ধর্মে আল্লাহর ওলীদের সম্মান দেয়া হয় না, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়? এর কোন জবাব আছে কি জনাব চরমোনাই পীর সাহেবের কাছে বা তার মুরীদদের কাছে?

নাকী তাবরিজী সাহেব অন্য কোন ধর্মে আল্লাহর পাগল ছিলেন বা অন্য নবীর উম্মত ছিলেন, তাই তার পাগলামী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্মে গ্রহণীয় হয়নি, তাকে শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে? আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيْ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অন্বেষণ করবে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৮৫)

চরমোনাই পীর সাহেব ঘটনায় উল্লেখিত তাবরীজী সাহেবের আল্লাহর শানে বেয়াদবী মূলক আচরণের

অযুহাত দেখাতে গিয়ে পিতার সাথে নিস্পাপ শিশুর বেয়াদবীর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ *যেরূপ শিশু যদি পিতার মুখে থাপ্পড় মারে কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তাহা পীড়াদায়ক হয়না বরং তাহাতে আরো মহব্বতের জোয়ার উঠে।*

এই উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি পরক্ষোভাবে তাবরীজী সাহেবের আল্লাহর শানে বেয়াদবীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তার এই স্বীকারোক্তি মোতাবেক কিন্তু তাবরীজী সাহেব কাফের প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু তাকে বাঁচাতে গিয়ে পীর সাহেব এমন একটি উদাহরণ পেশ করেছেন যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোন শিশু যখন পিতার মুখে থাপ্পড় মারে বা দাড়ী ছিড়ে তখন সে না বুঝেই তা করে থাকে। তার এই অনুভুতি নেই বা জ্ঞান নেই যে পিতার শানে এধরণের আচরণ চরম বেয়াদবী- অনেক বড় অন্যায়। একারণে পিতাও তার এ কাজকে অপরাধ মনে করেন না। তার হুঁশ হয়নি একথা বলে তাকে ক্ষমা করে দেন, আদর-সোহাগ করেন। আমরা পূর্বে হাদীছ উল্লেখ করেছি যে, শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তার কোন অপরাধই লিপিবদ্ধ করেন

না। অতএব পিতা কিরূপে তার অপরাধ ক্ষমা না করে পারেন?

এখন প্রশ্ন তাবরীজী সাহেব কি ঐ শিশুর মত অনুভুতিহীন, অজ্ঞান ও হুঁশহারা যে আল্লাহর শানে তার বেয়াদবী মূলক আচরণ অপরাধ বলে গণ্য হবে না?

কারামাতে আউলিয়া

কেউ হয়তো বলতে পারেন আপনারা কি কারামাতে আউলিয়া বিশ্বাস করেন না? যুগে যুগে কালে কালে আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে যে কারামাত প্রকাশ হয়েছে তা মানেন না? জবাবে আমরা বলবঃ অবশ্যই, আমরা কারামাতে আউলিয়াতে বিশ্বাস রাখি। তবে আল্লাহর শানে বেয়াদবী মূলক কোন কথাকে কারামত বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি না যে, কোন মানুষ বাহ্যিকভাবে শরীয়তের পবন্দ হবে, আর মারেফতের নাম করে আভ্যন্তরিনভাবে তার বিপরীত চলবে আর বলবে এটা কারামতি। আমরা বিশ্বাস করি এধরণের আচরণ আল্লাহর ওলী তো দূরের কথা সাধারণ মুসলমানের জন্যেও

শোভনীয় নয়; বরং তা শয়তানের ওলী তথা মুনাফেকদের আচরণ।

আমরা মানি যে আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে অনেক কারামত প্রকাশ ঘটেছে এবং এখনও ঘটে থাকে। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাসও বটে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেনঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার মূলনীতির অন্তর্গত হচ্ছে, আউলিয়াদের কারামতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। ওলীদের মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য নয় এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে তা মেনে নেয়া।[১]

এ বিষয়ে আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। করামাত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ওলী কে, কিভাবে আল্লাহর ওলী হওয়া যায়, ওলীদের পরিচয় কি.. ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আল্লাহর ওলী কে?

[১] . মাজমু ফাতাওয়া ৩/১০৩ পৃঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে, তাঁকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাতকে মান্য করে নিজের জীবনকে পরিচালনা করার পাশাপাশি যাবতীয় শির্ক ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকবে সেই আল্লাহর ওলী বা আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। আর ওরা হচ্ছে তারাই যারা ঈমানদার এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে। (সূরা ইউনুসঃ ৬২, ৬৩)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

যারা ঈমানদার আল্লাহ্ তাদের ওলী (বন্ধু), তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আনেন। (সূরা বাকারাঃ ২৫৭)

তিনি আরো এরশাদ করেনঃ

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুমিনরা- যারা সালাত আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং যারা বিনয়ী। আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে এবং মুমিনদের সাথে, (তারা আল্লাহর দলভুক্ত হল এবং) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। (সূরা মায়েদাঃ ৫৫, ৫৬)

আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপনে নয়; বরং উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন,

(أَلا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي فُلانًا لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وفي رواية المتقون)

তোমরা জেনে রাখ, উমুক বংশের লোকেরা আমার বন্ধু নয়; বরং আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং নেককার মুমিনগণ। (অন্য বর্ণনায়) আমার বন্ধু হলেন মুত্তাকী বা আল্লাহ্ভীরুগণ।[১]

---

১ . বুখারী ও মুসলিম।

অতএব যারা আল্লাহর প্রতি শির্ক মুক্ত ঈমান রাখে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলে তারাই আল্লাহর ওলী। তারা রাসূলের ওলী, মুমিনদের ওলী। وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ পরস্পর পরস্পরের ওলী- বন্ধু। (সূরা তাওবাঃ ৭১)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। (সূরা আনফালঃ ৭২)

আল্লাহর প্রতি যার ঈমান যত মজবুত, ভয়-ভীতি, ভালবাসা ও আশা-আকাংখা নিয়ে যে যত বেশী আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ভরসা ও আস্থা রেখেছে, তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, শির্ক ও কুফরী থেকে নিজের ঈমানকে হেফাযত রেখেছে, যাবতীয় ইবাদত নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করেছে, আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন তাকে ভালবেসেছে, তিনি

যাকে ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করেছে, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমানাকে লঙ্ঘণ করেনি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাতকে সবকিছুর উর্ধে স্থান দিয়েছে, নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোন ইবাদত সৃষ্টি করেনি, বিদআত-কুসংস্কার থেকে দূরে থেকেছে, মুমিনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুমিনদেরকে ভালবেসেছে সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলী। এই বৈশিষ্টগুলো যার মধ্যে যে পরিমাণ বিদ্যমান থাকবে, সে সেই পরিমাণ আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করবে।

টাইটেল, সার্টিফিকেট-সনদ, সাইনবোর্ড, দরবার শরীফ, বংশের শাজারা নামা, বাহ্যিক অলৌকিকতা, মুরীদ ইত্যাদি না থাকলেও আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ওলী হতে পারে। আওলাদে রাসূল বা সৈয়দ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা ওলী হওয়ার জন্যে শর্ত নয়। বিশাল পাগড়ী বা আলখেল্লাধারী হওয়া ওলীর জন্য শর্ত নেই। আবশ্যক নয় যে মানুষের মাঝে ওলী হিসেবে তাকে পরিচিত হতে হবে। এও আবশ্যক নয় যে তার খানকা বা দরবার শরীফ না থাকলে তিনি

ওলী হতে পারবেন না। কেননা ওলী হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত যে বেশী আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা হুজুরাতঃ ১৩) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إلاَّ بِالتَّقْوَى)

তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির মাপকাঠি ব্যতীত অনারব মানুষের উপর কোন আরবের কোন মর্যাদা নেই।[১] তিনি আরো বলেন, مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ যার আমল তাকে পশ্চাতে ফেলেছে, তার বংশ মর্যাদা তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না। (সহীহ্ মুসলিম) কথায় বলে, জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।

আল্লাহর ওলীরা ফরয ও নফল ইবাদতের পাবন্দ হয়। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, সে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। বান্দার উপর আমি

---

[১] . বায়হাকী, হাদীছটি সহীহ্ দ্রঃ সিলসিলা সহীহা হা/২৭০০

যা ফরয করেছি তার মত এমন কোন আমল নেই যা সম্পাদন করে সে আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এরপর বান্দা নফল ইবাদত করতে করতে আমার আরো নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণ হয়ে যাই যা দ্বারা সে শোনে, তার দৃষ্টি হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা ধরে, তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। সে আমার দ্বারাই শোনে, আমার দ্বারাই দেখে, আমার দ্বারাই ধরে এবং আমার মাধ্যমেই চলে। (সে আল্লাহর এত বেশী নিকটবর্তী হয় যে,) আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে প্রদান করি, আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি তাকে আশ্রয় দেই।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া বলেনঃ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে এ হাদীছে দুটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ ফরয ইবাদতের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন। দ্বিতীয়তঃ ফরযের পর নফল ইবাদত আদায় করে নৈকট্য অর্জন।[২]

নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ওলী কেউ নেইঃ

[১] . সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ রিকাক, অনুচ্ছেদঃ বিনয়-নম্রতা হা/৬০২১।

[২] . মাজমু' ফাতাওয়া- ইমাম ইবনে তাইমিয়া ৩/২৫৬ পৃঃ

সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলী হচ্ছেন তাঁর নবীগণ। নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন রাসূলগণ। রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন উলুল্ আযম পাঁচ জন। তাঁরা হলেন: নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম)। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি খাতামুন্নাবিয়্যিন, ইমামুল মুত্তাকীন, আদম সন্তানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণ করে তাঁকেই আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি নিরূপন করেছেন। অতএব তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পরিপূর্ণরূপে ঈমান না আনলে এবং জাহেরী ও বাতেনীভাবে তাঁর অনুসরণ না করলে কখনই আল্লাহর ওলী হওয়া যাবে না।

উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বশ্রেষ্ঠঃ

সমগ্র উম্মতের মধ্যে নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন উম্মতে মুহাম্মাদী। আল্লাহ্ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্যে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।□ (আলে

ঈমরানঃ ১১০) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ তোমাদের মাধ্যমে পৃ থিবীকেসত্তরটি জাতি পূর্ণ হয়েছে। তোমরা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত।[১]

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আল্লাহর ওলীঃ

আর এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী হচ্ছেন আবু বকর (রাঃ), তারপর ওমার (রাঃ) তারপর উছমান (রাঃ), তারপর আলী (রাঃ)। তাঁদের পর হচ্ছেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অবশিষ্ট সাহাবীগণ। তাঁদের পর নবুওতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজের ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন অন্যান্য সাধারণ সাহাবীগণ (রাযিয়্যাল্লাহু আনহুম আজমাঈন)। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের পর কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন মানুষ আসবে না যিনি বেলায়াত ও মর্যাদার দিক দিয়ে সাহাবীদের সমতুল্য হতে পারবেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির সনদ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। তিনি বলেন,

---

[১] . বাহয বিন হাকীম (রাঃ) থেকে মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাদীছটি হাসান। দ্রঃ সহীহুল জামে হা/৪০৬৫

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾

যে সব মুহাজির ও আনসার ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী ও প্রথম, আর যেসব লোক একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।" (সূরা তাওবাঃ ১০০)

তিনি আরো বলেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ঐ সকল মুমিনদের প্রতি যারা বৃক্ষতলে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছেন।" (সূরা ফাতাহ্ : ১৮) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ যারা বৃক্ষতলেআমার নিকট বায়আত নিয়েছে তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"[১]

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের সনদ বর্ণনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো

---

[১] . হাদীছ সহীহ দ্রঃ সহীহ্ আবু দাউদ হা/৪৬৫৩, সহীহ তিরমিযী হা/৩৮৬০। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া নামক এলাকায় মক্কার কাফেরদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়, ইতিহাসে তাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সন্ধির আগে উছমান (রাঃ)কে দূত হিসবে মক্কায় পাঠানো হয়েছিল এ সংবাদ দিয়ে যে, মুসলমানগণ ওমরা পালনের জন্যে আগমণ করেছে, তাই তাদেরকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দেয়া হোক। কিন্তু কাফেররা দূতের সাথে প্রচলিত আচরণ ভঙ্গ করে, উছমান (রাঃ)কে বন্দি করে। এখরব মুসলমান শিবিরে ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে সাহাবায়ে কেরাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে হাত রেখে আমরণ যুদ্ধ করার বাইয়াত গ্রহণ করেন। কুরআন-হাদীছে এঘটনাটিকে বাইয়াতুর্ রিযওয়ান বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর ঐ বাইয়াতটি একটি বৃক্ষের নীচে হয়েছিল।

এরশাদ করেনঃ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। তারপর তাদের পরের যুগের মানুষ। তারপর তাদের পরের যুগের মানুষ।[১]

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা সকল বান্দার অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অন্তরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পেয়েছেন তাই তাঁকে নিজের জন্য চয়ন করেছেন এবং তাঁকে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ করেছেন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পর অপর বান্দাদের কলবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর সাহাবীদের কলব সর্বাধিক উত্তম পেয়েছেন, তাই তাঁদেরকে তাঁর (মুহাম্মাদ সাঃ) সহযোগী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর দ্বীন রক্ষার জন্য তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছেন।[২]

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে এরকম বহু আয়াত, হাদীছ ও মনিষীদের উক্তি রয়েছে, যা উল্লেখ

---

[১] . আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে সহীহ মুসলিমে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

[২] . মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬০০, মওকূফ সূত্রে হাসান, দ্রঃ শরহে আকীদা তাহাবিয়া ৫৩০ পৃঃ।

করলে আলাদা একটি কিতাব রচনা করা দরকার। অতএব আল্লাহর মারেফতের বিষয়ে, জাহেরী-বাতেনীভাবে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে, ইবাদত-বন্দেগী, অনুসরণ-অনুকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের সমতুল্য কোন ওলী, কোন আবেদ, কোন আলেম, কোন যোদ্ধা বা অন্য কেউ পৃথিবীতেআগমণ করবে না। তাঁদের যুগে যা দ্বীনের কাজ বা ইবাদত রূপে পরিচিত ছিল না, পরবর্তী যুগে তা গ্রহণীয় হতে পারে না।

নবীজীর অনুসরণ ছাড়া ওলী হওয়া যাবে নাঃ

কাফের, মুশরিক ও ইহুদী খৃষ্টানরাযেমন আল্লাহর ওলী হতে পারে না, তেমনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উম্মত দাবী করার পর, তাঁর শরীয়ত জাহেরী ও বাতেনীভাবে কোন মানুষ অনুসরণ না করলেও সে আল্লাহর ওলী হতে পারবে না।

অনুরূপভাবে কোন মানুষ যদি দাবী করে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শরীয়ত সাধারণ মুসলমানদের জন্য প্রজোয্য, কিন্তু যারা আল্লাহর ওলী, বা আবদাল, বা কুতুব ইত্যাদি তারা বাতেনীভাবে তা মানতে বাধ্য নন, অথবা তারা বাতেনীভাবে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আদেশ-নিষেধ লাভ করেন, অথবা দাবী করে যে, আল্লাহর কিছু ওলী আছেন যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়নি এবং তাদের তা দরকারও নেই; বরং আল্লাহর কাছে যাওয়ার তাদের আলাদা কোন রাস্তা আছে, অথবা বলে যে তারা প্রয়োজনীয় বিষয় কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেন, অথবা বলে যে, এরা শরীয়তের বাহ্যিক বিষয়গুলো মানেন কিন্তু বাতেনী মারেফতী বিষয়ে তাদের রাস্তা ভিন্ন তবে এরা কেউ আল্লাহর ওলী নয়; বরং **শয়তানের ওলী**। কেননা আল্লাহর নবী ও রাসূলগণই (আঃ) হচ্ছেন বান্দার সাথে আল্লাহর যোগসূত্রের মাধ্যম। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ ধর্মের তাবলীগ করেছেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ, শান্তি ও শাস্তির ওয়াদা, হালাল-হারাম প্রভৃতি বান্দার কাছে

পৌঁছিয়েছেন। অতএব ধর্ম ওটাই যা আল্লাহর রাসূলরা ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং কোন মানুষ যদি বিশ্বাস রাখে যে নবী-রাসূলদের পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ ছাড়া কোন ওলীর আল্লাহর কাছে পৌঁছার ব্যবস্থা আছে, তবে সে আল্লাহর ওলী নয়; শয়তানের ওলী।

পূর্ব যুগে নবী-রাসূলগণ এলাকা ভিত্তিক প্রেরীত হওয়ার কারণে এক এলাকার লোকের অন্য এলাকার নবীর অনুসরণ বাধ্য ছিল না। যেমন খিযির (আঃ)এর জন্য মূসা (আঃ)এর অনুসরণ বাধ্য ছিল না। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাতামুন্নাবিয়্যিন, তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জিন-ইনসান সকলের কাছে নবীরূপে প্রেরীত। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেছেন। (সূরা মায়েদাঃ ৩) তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর যে ঈমান না আনবে সে মুমিন নয়; আল্লাহর ওলী হওয়া তো দূরের কথা। যদি এরূপ দাবী করে যে, যাহেরীভাবে সব কিছুর উপর ঈমান রাখে বাতেনীভাবে নয় তবে সে কাফের-মুনাফেক।

যদি দাবী করে যে শরীয়ত হচ্ছে যাহেরী রাস্তা আর মারেফত বাতেনী রাস্তা, অথবা দাবী করে যে শরীয়তের জ্ঞান লাভ করে মারেফত হাসেল করা যাবে না অথবা বলে যে, মারেফতের রাস্তা শরীয়ত থেকে আলাদা তবে সেও আল্লাহর ওলী নয়; **শয়তানের ওলী**। অথবা কেউ যদি দাবী করে যে শরীয়ত তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে লাভ করেও আল্লাহকে পাওয়া যাবে না, কিংবা বলে যে, মারেফতের রাস্তা খুবই গোপন ও সতন্ত্র তাই একজন পীর বা ওলী না ধরলে এবং তাদের কাছে মারেফতের জ্ঞান না পেলে আল্লাহকে চেনা যাবে না, তবে সেও কখনই আল্লাহর ওলী নয়; বরং সে **শয়তানের ওলী**। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দুটি রাস্তা দেননি। তিনি তাঁকে যে রাস্তা দিয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

আর আমি আপনার কাছে এ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি সত্যসহকারে, যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সমস্ত কিতাবের

সংরক্ষকও; অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন, আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আপনাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি নির্দিষ্ট শরীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৮)

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ শরীয়তের উপর; সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করেন, অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" (সূরা জাছিয়াঃ ১৮)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

এটাই আমার সোজা পথ, তোমরা এটারই অনুসরণ কর। এপথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ কর না, অন্যথায় তোমাদেরকে তাঁর সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দূরে সরিয়ে দিবে। আল্লাহ্

তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা বেঁচে থাকতে পার।) (সূরা আনআমঃ ১৫৩)

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা আঁকলেন, তারপর বললেনঃ এটা হচ্ছে আল্লাহর পথ। অতঃপর তার ডানে ও বামে কতগুলো রেখা টানলেন এবং বললেন এগুলোও পথ, কিন্তু প্রত্যেকটা পথে একজন করে শয়তান বসে আছে সে মানুষকে তার পথে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি পূর্বের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেনঃ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ... (এটাই আমার সরল পথ, তোমরা এটারই অনুসরণ করে চল।) [১]

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পথ খুবই পরিস্কার ও স্বছ এখানে কোন গোপনীয়তা নেই রাখ-ঢাক নেই। তিনি বলেনঃ "স্বছ ও স্পষ্ট দলীল প্রমাণের উপর আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি। দিনের মত রাতও পরিস্কার। অর্থাৎ

---

[১] . হাদীছটি ইমাম আহমাদ, নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, সনদ হাসান দ্রঃ সহীহ মেশকাত- আলবানী, অনুচ্ছেদঃ কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা হা/১৬৬

এখানে কোন সংশয়-সন্দেহ, অস্পষ্টতা নেই কিংবা গোপনীয়তা নেই। ধ্বংস প্রাপ্ত লোক ছাড়া তা থেকে কেউ বিচ্যুত হবে না। যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক বিভেদ দেখতে পাবে, তখন আবশ্যক হচ্ছে, তোমরা আমার এবং সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত সমূহকে আঁকড়ে ধরবে।[১]

তিনি আরো বলেনঃ

(مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ)

জান্নাতের নিকটবর্তী করে, আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে এমন কোন বিষয় বাকী নেই, যা তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়নি।[২] অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে সব আমল দরকার তার সবকিছুই তিনি আমাদের সামনে প্রকাশ করে গেছেন এবং জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে এরকম সকল আমল থেকে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

[১]. এরবায বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে হাদীছটি সহীহ, দ্রঃ সহীহ্ ইবনে মাজাহ হা/৪৩

[২]. ত্বাবরানী, হাদীছ সহীহ, দ্রঃ সিলসিলা সহীহা হা/১৮০৩

অতএব শরীয়ত, তরীকত, মারেফত, হাকীকত যে নামই ব্যবহার করা হোক না কেন, যে পথেই আহবান করা হোক না কেন, তা যদি পবিত্র কুরআন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সহীহ্ হাদীছ মোতাবেক না হয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যাতে আমার নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।[১] সুতরাং আমল বলেন, আর তরীকাই বলেন যদি তার অস্তিত্ব নবীজীর শরীয়তে খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে আল্লাহর কাছে তা গ্রহণীয় হবে না; বরং শির্ক অথবা বিদআত বলে গণ্য হবে- যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আল্লাহর ওলীরা কি নিষ্পাপ?

আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্যে এমন কোন শর্ত নেই যে তিনি নিষ্পাপ হবেন, তার কোন ভুল হবে না কোন ত্রুটি হবে না বা তার দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হবে না। হতে পারে আল্লাহর কোন বিধান তিনি

---

১ . আয়েশা (রাঃ) থেকে সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আকজীয়া, অনুচ্ছেদঃ অন্যায় হুকুম এবং নব আবিস্কৃত বিষয়সমূহ প্রত্যাখ্যাত হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীছ/ ৩২৪৩।

জানেন না। হতে পারে দ্বীনের কোন বিষয়ে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন, ফলে ধারণা করছেন যে এটা আল্লাহ্র আদেশ বা ওটা তাঁর নিষেধ; কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। হতে পারে তার মাধ্যমে আশ্চর্য কোন ঘটনা ঘটে গেছে আর তিনি ধরে নিয়েছেন এটা কারামাতে আউলিয়া; অথচ জ্ঞানে ত্রুটি থাকার কারণে হয়তো শয়তান তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তিনি বুঝতেই পারছেন না যে, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। অবশ্য এ সমস্ত কারণে তিনি আল্লাহর বেলায়াত বা ওলীর মর্যাদা থেকে বের হয়ে যাবেন না। কেননা ভুল-ত্রুটির গুনাহ আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ্ শিখিয়ে দিয়েছেনঃ

﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করে ফেলি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।। (সূরা বাকারাঃ ২৮৬)

এই জন্যে যেহেতু আল্লাহর ওলীর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেহেতু তার যাবতীয় কথাকে মেনে নেয়া বা নির্ভুল মনে করা জায়েয নেই। কারণ নির্ভুল

মনে করলে তাকে নবীর আসনে বসিয়ে দেয়া হল। অনুরূপভাবে কোন ওলীর জন্যে জায়েয নেই যে, তার অন্তরে কোন বিষয়ের উৎপত্তি হলেই যেন তার উপর তিনি ভরসা না করেন যতক্ষণ বিষয়টিকে শরীয়তের সাথে মিলিয়ে না নিবেন। চাই উক্ত বিষয় কোন এলহাম হোক বা গায়েবী আওয়াজ হোক বা কোন কারামত হোক। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তিনি তা গ্রহণ করবেন, অন্যথা প্রত্যাখ্যান করবেন।

আমরা জানি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ফযীলত অতুলনীয়। তিনি অনেক ক্ষেত্রে যে মত পোষণ করেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহামকৃত ছিল।[১] এজন্যে তাঁর সমর্থনে কুরআনে অনেক আয়াতও নাযিল হয়েছে; বরং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর স্বাক্ষ্য অনুযায়ী

---

[১] . যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর মত পোষণ করেছিলেন মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া। আর ওমার (রাঃ) তাঁদের বিপরীত মত পোষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলতে। অথচ ওমার (রাঃ)এরর মতই সঠিক ছিল। এজন্যে তাঁর সমর্থনে আয়াতও নাযিল হয়। দেখুন সূরা আনফালের ৬৭-৬৯ নং আয়াতের তাফসীর। ঘটনা বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমাদে ও তিরমিযীতে মানাকেব অধ্যায়ে।

এলহামকৃত ব্যক্তি ছিলেন।[১] আল্লাহর পক্ষ থেকে (ঐশী নির্দেশে) তাঁর অন্তরে যে কথার সৃষ্টি হত, তা সত্যে পরিণত হত। তাঁর সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার পর কেউ নবী হলে ওমার নবী হত। কিন্তু আমার পর কোন নবী নেই।[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ হে ওমার! শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি এমন ব্যক্তি শয়তান তোমাকে কোন রাস্তায় চলতে দেখলে সে অন্য রাস্তা দিয়ে যায়।[৩]

অথচ তাঁর কাছ থেকেও ভুল প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি নিজ ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না বা তিনি নিজের মতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেননি। তিনি নিজে কখনো দাবী করে

---

[১] . নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের পূর্ব জাতির মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যাদের কাছে এলহাম হত, আমার উম্মতের মধ্যে এরকম কেউ থাকলে ওমার তাদের অন্যতম।" (বুখারীতে ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়ে ও মুসলিমে ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)

[২] . উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ মেশকাত হা/ ৬০৩৮

[৩] . সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস থেকে বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

বলেননি যে, আমি এলহামকৃত ব্যক্তি; বরং তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধানের সামনে মস্তক অবনত করে তাঁদের কথা নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়েছেন।

যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে অপমান জনক হওয়ার কারণে তিনি কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারছিলেন না। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সামনে প্রকাশ্য প্রতিবাদও করেছেন। নবীজী তাঁর কথাকে গ্রাহ্য না করলে তিনি একই প্রতিবাদ আবু কবর (রাঃ)এর সামনেও পেশ করছেন। কিন্তু আবু বকরও তাঁর কথায় আমল দেননি। পরবর্তীতে ওমার যখন বুঝলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং ঐ প্রতিবাদকে গুনাহের কাজ মনে করে তা থেকে তওবা করলেন এবং অনেকগুলো নেক কাজ করলেন যেন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।[১]

---

[১] . এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বুখারীতে শর্ত অধ্যায়ে ও মুসলিমে জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ নবীজী ইন্তেকাল করলে ওমার (রাঃ) তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বরং তিনি উদ্দ্যত তরবারী হাতে বলেছিলেন, যে বলবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃ ত্যুবরণ করেছে তাকে আমি দ্বিখন্ডিত করে দিব। নির্ভিক সৈনিক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যোগ্য উত্তরসূরী আবু বকর (রাঃ) তাঁর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, ওমার! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আবু বকর (রাঃ) মেম্বারে আরোহণ করে বললেন, জেনে রাখ! যারা মুহাম্মাদের ইবাদত করত, মুহাম্মাদ মৃ ত্যু বরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত কর, আল্লাহ্ চিরঞ্জিব চিরস্থায়ী তিনি কখনো মৃ ত্যু বরণ করবেন না। আর তিনি তেলাওয়াত করলেন আল্লাহর কুরআনঃ

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾

মুহাম্মাদ তো আল্লাহর রাসূল ছাড়া অন্য কিছু নন, তাঁর পূর্বে সমস্ত রাসূল গত হয়েছে। তিনি যদি মৃ ত্যু বরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা কি দ্বীন পরিত্যাগ করবে? (সূরা আল ঈমরানঃ ১৪৪) এই

আয়াত শুনে ওমার (রাঃ)এর চেতনা ফিরে এল। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।[১]

সাহাবায়ে কেরামের অনেকের ক্ষেত্রে এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, কিন্তু কখনই তারা নিজেদের মতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেননি বা প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করে বলেননি যে বাতেনীভাবে এটা ঠিক আছে, অথবা তাঁরা আধ্যাত্মিকতা বা মারেফত শিক্ষা দেয়ার নাম করে লোকদেরকে পরকালে তাদের উসীলায় পার হওয়ার দাওয়াত দেননি বা এ উদ্দেশ্যে কাউকে মুরীদ করেননি। অথচ তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের মধ্যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেনঃ দুনিয়ার সকল মানুষের কথা গ্রহণযোগ্যও হতে পারে প্রত্যাখ্যাতও হতে পারে, কিন্তু একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সকল কথা গ্রহণযোগ্য।[২]

---

[১] . ঘটনাটি বিস্তারিত দেখুন সহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৬২৭। আর্ রাহীকুল মাখতুম- সফীউর রহমান মুবারকপুরী প্রণীত রাসূল (সাঃ)এর অনুপম জীবনী গ্রন্থ। (বাংলায় অনূদিত)

[২] . মিনহাজ সুন্নাহ নববিয়্যাহ- ইবনে তাইমিয়াঃ ৩/৫০৩ পৃঃ।

অতএব প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ কাজ করেও যদি কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হয়েও যায়, তবে তা দ্বারা প্রমাণ হবে না যে সে আল্লাহর ওলী। কেননা ইমাম শাফেঈ, জুনাইদ বাগদাদী, আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (রহঃ) প্রমূখ মনিষীগণ বলেছেন, যদি দেখ যে কোন লোক পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অথবা বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, তাকে দেখে ধোকায় পড়বে না, যতক্ষণ বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে শরীয়তের আদেশ-নিষেধের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পূর্ণ অনুসরণ না পাওয়া যাবে।[১]

তাহলে কিভাবে চরমোনাই পীর সাহেব বলতে পারেনঃ *শরীয়তের কামেল পীর সাহেব যদি এমন কোন হুকুম দেন, যাহা প্রকাশ্যে শরীয়তের খেলাফ হয়, তবুও তুমি তাহা নিরাপত্তিতে আদায় করিবে। কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরী করিয়াছেন। তিনি তাহার উঁচু-নীচু অর্থাৎ ভাল-মন্দ সব চিনেন, কম বুঝের দরুণ জাহেরাভাবে যদিও তুমি উহা শরীয়তের*

---

[১] . ওলী সংক্রান্ত এই আলোচনাগুলোর অধিকাংশই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) প্রণীত 'আল্ ফুরকান বায়না আউলিয়াইর্ রহমান ওয়া আউলিয়াইশ্ শায়তান' নামক গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

খেলাফ দেখ কিন্তু মূলে খেলাফ নহে।? (আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহীঃ ৪১ পৃ ষ্ঠা)

সুবহানাল্লাহ্! কেন? উনি কি আলাদা কোন নবীর কাছ থেকে শরীয়ত শিখেছেন বা আলাদা কোন প্রভুর কাছ থেকে শরীয়ত পেয়েছেন যে, সাধারণ আলেমগণ যে কাজকে শরীয়তের প্রকাশ্য খেলাফ বলেন; অথচ তিনি গোপনে তা সঠিক-শুদ্ধ পেলেন? আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

)لا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ(

আল্লাহর নাফরমানী করে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য শুধু শরীয়ত সম্মত ভাল কাজে করতে হবে।[১]

---

[১] . বুখারী ও মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ। শায়খ আলবানী সিলসিলা সহীহা গ্রন্থে (১ম খন্ড ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীছ নং/১৮১) বলেনঃ উক্ত হাদীছটির প্রেক্ষাপট হচ্ছে, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে জনৈক লোককে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। ঐ আমীর অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে তার বাহিনীকে বলেন, তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। তখন তাদের মধ্যে একদল লোক আগুনে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল। (যেহেতু আমীরের কথা মেনে চলার নির্দেশ আছে) কিন্তু আরেক দল বলল, আমরা তো আগুন থেকেই বাঁচতে চাচ্ছি। (তাহলে কিভাবে এখন আগুনে প্রবশ করব?) পরবর্তীতে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট উল্লেখ করা হল। যারা প্রবেশ করতে চেয়েছিল তিনি তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা আগুনে প্রবেশ করলে কিয়ামত পর্যন্ত সেই আগুনের

মধ্যেই অবস্থান করতে।" আর অপর দলটিকে তিনি ভাল কথা বললেন। তারপর বললেনঃ "আল্লাহর নাফরমানী করে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য শুধু শরীয়ত সম্মত ভাল কাজে করতে হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

শায়খ আলবানী বলেনঃ এ হাদীছটি থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলার নাফরমানী করে কোন ব্যক্তির আনুগত্য করা চলবে না, চাই সে কোন বাদশাহ্ বা আমীর হোক অথবা আলেম হোক বা ওলী-পীর বা শায়খ হোক। এ হাদীছ দ্বারা কয়েকটি দলের বিভ্রান্তি সহজেই অবগত হওয়া যায়ঃ

প্রথম দলঃ পীর ও সুফী-সাধকদের অনুসরীরা। তারা তাদের পীর-শায়খদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। যদিও পীর তাদেরকে প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ আদেশ করেন। এই কারণে যে, বিষয়টি মুরীদের নযরে প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ হলেও মূলতঃ তা নয়। কেননা পীর সাহেব যা দেখেন ও জানেন মুরীদ তা জানে না ও দেখে না। আমি এরকম জনৈক শায়খকে জানি, যিনি নিজেকে পীর-মুর্শিদ বলে দাবী করেন। তিনি একদা কোন এক মসজিদে মুরীদদের সামনে বয়ান করতে গিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ঘটনাটির সারসংক্ষেপ এরকমঃ জনৈক সুফী-সাধক (মারেফতের কামেল পীর) তার এক মুরীদকে আদেশ করেন, আজ রাতে তুমি তোমার পিতাকে তোমার মায়ের পাশে শায়িত অবস্থায় পাবে, তাকে হত্যা করে আসবে। আদেশমত মুরীদ তার পিতাকে হত্যা করে। অতঃপর পীরের আদেশ বাস্তবায়ন করতে পেরে, পীরের কাছে খুশি হয়ে উপস্থিত হয়। তখন পীর সাহেব তার দিকে স্নেহের নযরে তাকিয়ে বলেনঃ তুমি কি মনে কর প্রকৃতপক্ষে তোমার পিতাকে হত্যা করছো? যাকে তুমি হত্যা করেছো, সে তোমার মায়ের শয্যা সঙ্গী (ব্যভিচারী)। তোমার প্রকৃত পিতা যিনি তিনি তো অনুপস্থিত।

শায়খ আলবনী বলেনঃ ঘটনাটি যে বাতিল ও মিথ্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই কেননাঃ

প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি ব্যভিচারী হলে তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করার অধিকার পীর সাহেবের নেই। এই অধিকার হচ্ছে একমাত্র দেশের শাসনকর্তার বা তার প্রতিনিধির।

দ্বিতীয়তঃ যদি হত্যাই করতে হয়, তবে পুরুষটিকে শুধু কেন? মহিলাটিকেও তো হত্যা করা উচিত। উভয়েই একসমান অপরাধী।

তৃতীয়তঃ বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করা। অন্য কোনভাবে নয়।

অতএব ঐ পীর যে কয়েক দিক থেকে শরীয়তের খেলাফ কাজ করেছেন তা সুস্পষ্ট।

তিনিই (চরমোনাই পীর) আবার লিখেছেনঃ *কোন পীর সাহেব যদি মেয়েলোককে সম্মুখে যাইতে বলে, বা তাহার সঙ্গে কথা বলিতে চাহে, তবে মনে করিবেন, এই ব্যক্তি পীর নহেন বরং দাজ্জাল।* (ভেদে মা'রেফতঃ ৫৬ পৃ ঃ)

কেন? ইনি দাজ্জাল হবেন কেন? মেয়েলোককে সম্মুখে যেতে বলা জাহেরীভাবে শরীয়তের খেলাফ হলেই বা কি, পীরের কাছে তো মূলে খেলাফ নয়, কারণ উনি তো ভাল-মন্দ বুঝেন, তাই তার উপর

দ্বিতীয় দলঃ মুকাল্লেদগণ। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কথার চাইতে মাযহাবের কথাকে অগ্রগণ্য মনে করে। অথচ মাযহাবের অনেক কথা সুস্পষ্ট হাদীছ বিরোধী। যেমন কাউকে বলা হল, ফজরের ফরয নামায চলাবস্থায় সুন্নাত নামায পড়বে না। কেননা এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। তখন মুকাল্লেদ একথা মানবে না, বলবে আমাদের মাযহাবে এরূপ করা জায়েয। যদি কোন মুকাল্লিদকে বলেন, হিল্লা বিবাহ বাতিল। কেননা এরূপ যে করে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত (অভিশাপ) করেছেন। তখন আপনাকে বলবে, আমাদের মাযহাবে এটা জায়েয। এভাবে হাজার হাজার মাসআলায় মুকাল্লিদগণ সহীহ্ হাদীছের বিরোধিতা করে থাকে।

তৃতীয় দলঃ যারা নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের অনুসরণ করে। শরীয়তের প্রকাশ্য খেলাফ বিধান রচনা করলেও তারা তার অনুসরণ করে থাকে। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা অনুরূপ অন্যান্য প্রকাশ্য শরীয়তবিরোধী মতবাদ সমূহ। তাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ওরা, যারা ঐ মতবাদগুলোকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য প্রদানের ব্যর্থ অপচেষ্টা চালায়। বর্তমান যুগে পান্ডিত্য ও জ্ঞানের দাবীদার অনেক লোক এই অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে তাদের দ্বারা সাধারণ জনগোষ্ঠি ধোকায় পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতানুযায়ী এসমস্ত লোক এবং তাদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি প্রজোয্যঃ আল্লাহ্ বলেনঃ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ "ওরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতদেরকে এবং দরবেশদেরকে 'রব' হিসেবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবাঃ ৩১)

খারাপ ধারণা পোষণ করা ঠিক হবে কি? নাকি আপনাদের কাছ থেকে উনি কামেল হওয়ার সনদ নিয়ে শরীয়তের জাহেরী খেলাফ হুকুম দিলে সেটাতে আপত্তি করা যাবে না? কিন্তু সে সনদ না পেলে তার জাহেরী শরীয়তের খেলাফ আদেশে আপত্তি করা যাবে? আশ্চর্য আপনাদের বিচার!

মূল কথা হচ্ছে পীর সাহেব কামেল হোন বা নাকেস হোন তার প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী কোন আদেশই গ্রহণ করা যাবে না- আমল করা যাবে না। এরকম আদেশ এলেই সাথে সাথে তাতে আপত্তি জানাতে হবে এবং তার বিরোধীতা করতে হবে। অতএব পীর সাহেবের পরের উক্তি অনুযায়ী আগের উক্তি বাতিল প্রমাণিত হল।

আরো বাতিল প্রমাণিত হল যে, প্রকাশ্যে শরীয়তের খেলাফ কাজ করে বা আদেশ করে কেউ আল্লাহর ওলী হতে পারে না এবং তার দ্বারা কোন কারামত ঘটে গেলে সেটা যে শয়তানের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন তাবরিজী সাহেবের বেলায় (চরমোনাই পীর সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী) ঘটেছে। যেমন গঙ্গুহী সাহেব কর্তৃক জনৈক বৃদ্ধের হারানো ছেলেকে নিজ দরবারে বসেই মোরাকাবার মাধ্যমে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে ঘটেছে। প্রকৃত পক্ষে তাবরিজী সাহেব মৃতকে জীবিত করেননি; বরং শয়তান ঐ ছেলের আকৃতী ধারণ করে তাকে বিভ্রান্ত করেছে। এমনিভাবে জিন-শয়তান ঐ হারানো ছেলের

আকৃতি ধারণ করে বৃদ্ধের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ভক্তির আতিশয্যে এবং গঙ্গুহী সাহেবের উপর অগাধ বিশ্বাস থাকার কারণে মোহতামিম সাহেব তার পীর গঙ্গুহী সাহেবকে জাহাজ উদ্ধারকারী হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যা দেখেছেন তা ছিল শয়তান। তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য গঙ্গুহী সাহেবের আকৃতিতে উদ্ধারকারী হিসেবে তন্দ্রার ভিতরে সে উপস্থিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে *গঙ্গুহী সাহেবের শরীরের ৩৬০টি জোড়া সব পৃথকভাবে হুজরার মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত শরীর মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-পায়ের প্রত্যেকটি জোড়া হইতে আল্লাহু যেকের বাহির হইতেছে।* (আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহীঃ ৫৯ পৃঃ) কথাগুলোও মিথ্যা এবং কোন আল্লাহর ওলীর কাজ নয় বা কোন কারামতীও নয়। এ ধরণের অবস্থা যাদু ছাড়া অন্যভাবে সম্ভব নয়। কেননা একাজ সম্পূর্ণ শরীয়তের খেলাফ। শরীয়তের খেলাফ কাজ কখনো কারামতী হতে পারে না। এ ধরণের যিকিরের নযীর শরীয়তে মুহাম্মাদীতে নাই। সুতরাং তা বাতিল ও বানোয়াট কথা। তাছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহু শব্দ উচ্চারণ করা কোন যিকির নয়; বরং অনর্থক কাজ। কুরআনে এর কোন দলীল নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈন, সম্মানিত চার ইমাম, মুহাদ্দেছীনে কেরাম (রহঃ) কেউ এরকম শুধু আল্লাহু

শব্দ উচ্চারণ করে যিকির করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং নিঃসন্দেহে তা বিদআত বা গুমরাহী। আর বিদআত করে কোন ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হতে পারে না। যদিও তার দ্বারা কোন আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ হয়ে যায়, তবে তা যে শয়তানের পক্ষ থেকে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একইভাবে *মঈনুউদ্দীন চিশতী কোন সময় আঘাত পাইলে তাহার শরীর মোবারক হইতে যে রক্ত বাহির হইত, তাহা জমিনে পড়া মাত্র কালেমায়ে তৈয়েবার নক্সা হইয়া যাইত।* (আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহীঃ ৫৩ পৃ ঃ) চরমোনাই পীরের এই কথাটিও ভ্রান্ত ও শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে বাতিল এবং তা কারামতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ তায়েফে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শরীর মোবারক থেকে রক্ত বের হয়েছে কিন্তু তা দ্বারা কালেমার নক্সা তৈরী হয়নি। তাছাড়া শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়লে তা নাপাক, ওযু ভঙ্গের একটি কারণ।[১] এই অপবিত্র বস্তু দ্বারা পবিত্র কালেমা লিখা হয়ে যাওয়া শরীয়ত বিরোধী কথা। এই কারণে তা পরিত্যাজ্য।

[১] . বিষয়টি মতবিরোধর্পূণ। হানাফী মাযহাব মতে শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়লে ওযু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে এটা ওযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য নয়। (আল্লাহ্ই সঠিক জ্ঞান রাখেন)

মানসুর হাল্লাজঃ অনুরূপভাবে মানসুর হাল্লাজের বেলায় ঘটেছে। হাল্লাজের দ্বারা যে সকল কারামত জাহের হয়েছে বলে কথিত আছে তা সবই মিথ্যা ও শয়তানী কথা। হাল্লাজ সম্পর্কে চরমোনাই পীর সাহেব লিখেছেন যে, *ফেরাউন বড়াই করেও আনাল হক বলার কারণে ধ্বংস হইয়াছে এবং হাল্লাজ মাওলার মুহাব্বতের জোশে ও আনাল হক বলিয়া খোদার নূরের সাথে মিশিয়া চির অমর হইয়া রহিয়াছেন।* (আশেক-মাশুক পৃ ঃ৪৯)

আমি প্রশ্ন করি, মানসূর হাল্লাজ বাহ্যিকভাবে শরীয়তের খেলাফ কাজ করেও কিভাবে আল্লাহর ওলী থাকলেন বা আল্লাহর হাবীব হলেন? তিনি যে সত্যিই আল্লাহর ওলী ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাকে মাহবূব বলে ঘোষণা দিয়েছেন সে সম্পর্কে কি জনাব পীর সাহেবের কাছে কোন ওহী নাযিল হয়েছে? আর উক্ত ওহীর আলোকে তিনি হাল্লাজকে আল্লাহর ওলী হওয়ার সনদ দিচ্ছেন। নাকি তিনি গায়েবের খবর রাখেন? আমরা জানি কোন মানুষের বাহ্যিক কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম তার অন্তরের সূচীপত্র। হাল্লাজ যদি অন্তরের দিক থেকে সত্যিই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ

ঈমানদার হতেন, তবে বাহ্যিকভাবে তার কাজ-কর্মও তার পরিচয় দিত। তার মুখ থেকে শির্কী কথা কখনও উচ্চারিত হত না। যেমন ছিলেন সাহাবয়ে কেরাম, তাবেঈন ও আইয়েম্মায়ে দ্বীন (রাঃ)। নাকী মুহাম্মাদী শরীয়ত আল্লাহর ওলীদেরকে চেনে না? ফলে বাতেনীভাবে আল্লাহর ওলীদেরকেও তার খেলাফ হওয়ার কারণে শাস্তি দেয়? তাহলে তো এমন শরীয়তের অনুসরণ করা উচিত নয়!!! (নাউযুবিল্লাহ্)

হাল্লাজের চেয়ে ফেরাউন উত্তমঃ

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায়, হাল্লাজের চেয়ে ফেরাউন অনেক ভাল ছিল। কারণ ফেরাউন বাহ্যিকভাবে কুফরী করলেও মনে মনে আল্লাহকে এবং নবী মূসা (আঃ)কে বিশ্বাস করত। আল্লাহ্ বলেন, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অন্যায় ও অহংকার বশতঃ তারা তা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।" (সূরা নমলঃ ১৪) অর্থাৎ মূসা (আঃ)এর আনিত বিধান সত্য- আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, তিনি সত্যই

আল্লাহর নবী, তাদের যাদু মিথ্যা ইত্যাদি বিষয় ফেরাউন ও তার অনুসারীদের অন্তর স্বীকার করেছিল, কিন্তু শুধু হঠকারিতার কারণে বাহ্যিকভাবে তারা সেগুলো অমান্য করেছে। এজন্যে তারা হয়েছে কাফের- আল্লাহর শত্রু।[১]

ফেরাউনের বাহ্যিক এই অহংকারের একটি কারণও ছিল। তাকে আল্লাহ্ বিশাল ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। তাকে বিরাট রাজত্ব দান করেছিলেন। সেই রাজত্ব ও ক্ষমতার দাপটে সে মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ [illegible] (সূরা নাযেআতঃ ২৪) আমরা জানি মানুষ শক্তের ভক্ত, সবলের প্রতি দূর্বল। ফেরাউনের অহংকারের কারণ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ،أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ .

---

[১] . দ্রঃ তাফসীর তবারী ও তাফসীর ইবনে কাছীর সূরা যুখরুফের ৫১-৫৪ নং আয়াতের আয়াতের তাফসীর।

ফেরাউন তার সমপ্রদায়কে ডাক দিয়ে বলল, হে আমার সমপ্রদায়! মিসরের বাদশাহী কি আমারই নয়? তোমরা কি দেখ না এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত? আমি কি এই ব্যক্তি (মূসা আঃ)র চেয়ে উত্তম নই? যে কিনা হীন ও দূর্বল এবং সুস্পরূপে কথাও বলতে পারে না। তিনি যদি সত্যিই নবী হতেন, তবে তাকে কেন স্বর্ণের বালা দেয়া হল না? কেনই বা তার সাথে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে নাযিল হল না? (ইত্যাদি ধোকাপূর্ণ কথাবার্তা বলে) সে তার সমপ্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, (তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিল) ফলে তারা তাকে মেনে নিল তার আনুগত্য করল। মূলতঃ তারা ছিল এক অবাধ্য সমপ্রদায়।" (সূরা যুখরুফঃ ৫১- ৫৪)

সম্মানিত পাঠক! ফেরাউনের মানষিক অবস্থার পরিচয় আমরা কুরআন থেকে পেলাম। কিন্তু মানসূর হাল্লাজের আভ্যন্তরীণ ঈমানের পরিচয় আমাদেরকে কে দিবে? ফেরাউন অন্তরে বিশ্বাস রাখার পরেও জাহেরা শরীয়তের খেলাফ চলার কারণে যদি আল্লাহর শত্রু হয়, তবে কিভাবে হাল্লাজ আল্লাহর বন্ধু হতে পারে? অথচ সেও তো জাহেরী শরীয়তের

খেলাফ চলেছে। উপরন্তু তার অন্তরে ঈমান আছে কি না সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, সে ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন ওহীও নেই।

যদি বলা হয়, আল্লাহর মুহাব্বতের অতিরিক্ত এস্কে পড়ে তিনি পাগল হয়ে এরকম কথা (আনাল হক- আমিই আল্লাহ্) বলেছেন। তাহলে তো পাগলের উপর ইসলামের কোন হুকুম প্রজোয্য নয়। পাগলের উপর থেকে হিসাবের কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দুনিয়ার জীবনে পাগলের বিবাহ-শাদী, বেচা-কেনা ইত্যাদি কোন কার্য-কলাপ বৈধ নয়, তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে তাকে কি বাধ্য করা যাবে? অথবা তার দ্বারা অন্যায় ঘটে গেলে তাকে দন্ড দেয়া যাবে?

যদি বলা হয়, মানসূর হাল্লাজকে শাস্তি দেয়ার সময় তার মাধ্যমে বহু কারামতী জাহের হয়েছে, তাতেই বুঝা যায় তিনি আল্লাহর আশেক ও ওলী ছিলেন। তবে আমরা বলব, যে সমস্ত কারামতীর কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলো সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। তার কোন সনদ নেই, দলীল-প্রমাণ নেই।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) লিখেছেনঃ যারা উল্লেখ করেছে যে, হাল্লাজকে হত্যা করার সময় তার রক্ত মাটিতে পড়েঁওআল্লাহ শব্দের নক্সা হয়ে যেত, (যেমন- চরমোনাই পীর লিখেছেনঃ *তার প্রত্যেক ফোটা রক্ত যমীনে পড়ামাত্রওআনাল হক বলিতে লাগিল.... শরীর থেকে রক্ত যমীনে পড়িয়া আনাল হক নক্সা হইয়া যাইত।*- আশেক মাশুকঃ ৫৩ পৃঃ[১] ইত্যাদি কথা নি:সন্দেহে মিথ্যা ও বানোয়াট। এ সমস্ত কথা জাহেল-মূর্খ অথবা মুনাফেক ব্যতীত কেউ বর্ণনা করতে পারে না। কোন যিনদীক-বক ধার্মিক ইসলামের শত্রু একথাগুলো বানোয়াট ভাবে উল্লেখ করেছে। যাতে করে ইসলামের শত্রুরা বলতে পারে যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শরীয়তে আল্লাহর ওলীদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। আমরা জানি ইতিহাসে অনেক নবী (আঃ)কে হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের অনুসারীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু

---

[১] . উক্ত পুস্তকে চরমোনাই পীর সাহেব হাল্লাজ সম্পর্কে আরো অনেক উদ্ভট ও হাস্যকর কথা উল্লেখ করেছেন, দলীল-প্রমাণ বিহীন উক্ত অবান্তর কথাগুলো উল্লেখ করে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করা সমিচীন নয়, তাই তা ছেড়ে দিলাম। (দেখুন উক্ত বইয়ের ৪৮-৫৩ পৃষ্ঠা)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনেক সাহাবীকে হত্যা করা হয়েছে। অনেক তাবেঈকে হত্যা করা হয়েছে। তাছাড়া অগণিত নেক লোককেও হত্যা করা হয়েছে। যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। তাঁরা ফাসেক কাফের ও জালেমদের তরবারীতে নিহত হয়েছেন। অথচ তাঁদের কারো রক্ত দ্বারাঙআল্লাহ্ নামের নক্সা হয়নি। অতএব হাল্লাজ কি এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ লোকদের চেয়েও উত্তম? তার রক্ত কি এই পূণ্যবানদের রক্তের চেয়েও পবিত্র?

হাল্লাজ যদি বেঁচে থাকত, তাকে যদি হত্যা না করা হত, তবে আরো অনেক জাহেল-মূর্খ তার দ্বারা বিভ্রান্ত হত। কেননা সে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি, কুসংস্কার ছড়াতো, শয়তানী হালত তার উপর গালেব ছিল। এই জন্যে তাকে সম্মান করে তারাই যারা শয়তানী হালতকে সম্মান করে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং মিথ্যাচারিতাকে আশ্রয় দেয়। যারা আল্লাহর প্রকৃত ওলী, যারা হাল্লাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত তারা কখনো তাকে সম্মান করেন না। এই জন্যে শায়খ আবুল কাসেম কুশায়রী সুফী-সাধক মাশায়েখদের মধ্যে হাল্লাজকে গণ্য করেননি। শায়খ

আবু ইয়াকূব নাহারজূরী নিজের মেয়েকে হাল্লাজের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন হাল্লাজের অবস্থা জানলেন, জানলেন যে সে যিনদীক বা বক ধার্মিক, তখন মেয়েকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। শায়খ আমর বিন উছমান উল্লেখ করতেন যে সে ছিল কাফের। তিনি বলেন, আমি একদা তার কাছে ছিলাম। এমন সময় হাল্লাজ জনৈক লোককে কুরআন পড়তে শুনে বলল, আমিও এরূপ কুরআন রচনা করতে পারি।[১]

ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) আরো বলেনঃ অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক বিভিন্ন গ্রন্থে হাল্লাজের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হাল্লাজকে হত্যা করার সময় অনেকে উপস্থিতও ছিলেন। ছাবেত বিন সিনান ওআখবারুল খোলাফা গ্রন্থে হাল্লাজের কথা উল্লেখ করেন। হাল্লাজকে হত্যার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন ইসমাঈল বিন আলী হাতাফী। তিনিওতারীখে বাগদাদ নামক গ্রন্থে হাল্লাজের হত্যাযজ্ঞ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আরো অনেকে হাল্লাজের ঘটনা উল্লেখ

[১] . মাজমূ ফাতাওয়া ৯/২১৪ পৃঃ

করেছেন। যেমন ঐতিহাসিক হাফেয আবু বকর খাতীব বাগদাদী ‘তারীখে বাগদাদ’ গ্রন্থে। আরো উল্লেখ করেছেন কাযী আবু বকর ইবনে তীব, আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযম প্রমূখ। আরো উল্লেখ করেছেন আবু ইউসুফ কাযভীনী এবং আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী। এদের মধ্যে কেউ উক্ত কাল্পনিক কথা উল্লেখ করেননি যে, হাল্লাজকে হত্যা করার সময় তার রক্ত দ্বারা ‘আল্লাহ্’ শব্দ বা ‘আনাল হক’ শব্দের নক্সা তৈরী হয়েছে, অথবা হত্যা করা হবে এই খবর শুনে হাল্লাজ আনন্দ প্রকাশ করেছে... ইত্যাদি কথা উদ্ভট ও বানোয়াট।”[১]

হানাফী মাযহাবে কারামতঃ

এই জন্যে কারামাত সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে (১৬/৩৭১) বলা হয়েছেঃ

কেউ যদি বলে যে, ওলীর কারামত স্বরূপ তার জন্য দূরের স্থান নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া জায়েয, সে জাহেল- মূর্খ। যাআফরানী এমত পোষণ করেছেন। কিন্তু ইবনে মুকাতেল এবং ইমাম আবু হানীফার ছাত্র

[১] . মাজমু’ ফাতাওয়াঃ ১/২০১ পৃঃ

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ (রহঃ) এধরণের কথাকে কুফরী বলেছেন।

উক্ত গ্রন্থের (৪/৪৪৭) হাশিয়াতে বলা হয়েছেঃ ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়ায় বলা হয়েছেঃ আমাদের ওলামাগণ উল্লেখ করেছেন যে, বড় বড় মো'জেযা সমূহ যেমন: মৃতকে জীবিত করা, লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা, সামান্য খাদ্য দ্বারা অনেক লোককে পরিতৃপ্ত করা, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানির ঝর্ণা বের হওয়া প্রভৃতি কোন ওলীর কারামত হতে পারে না। অনুরূপভাবে দূরবর্তী স্থান নিকটবর্তী হয়ে যাওয়াও কোন ওলীর কারামত হতে পারে না। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ আমার জন্যে যমীনকে গুটিয়ে দিয়েছেন। (তিরমিযী) ফলে তিনি দূরের জিনিসকে নিকটে দেখতে পেতেন। যদি এগুলো অন্যের কারামত হিসেবে যাহির হতে পারে তবে তা নবীদের জন্য খাস করার কোন উপকার থাকে না।

যদিও ফতোয়া বায্যাযিয়ার সকল বিষয়ে আমরা একমত নই, কেননা ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে, নবীদের মো'জেযা সমূহের কোন কোন বিষয়

কারামত হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈদের বেলায়ও ঘটেছে।

কোন ওলী কারামতের মালিক নয়ঃ

কারামত মূলতঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওলীদেরকে সাহায্য করার জন্য অথবা তাদের থেকে কোন বিপদ দূরীভূত করার জন্য দিয়ে থাকেন। আল্লাহর ওলীরা কোন কারামতের মালিক নন। তাঁরা ইচ্ছা করলেই যে কোন সময় যে কোন কারামত দেখাতে পারেন এমন কোন ক্ষমতা তাঁদের নেই; বরং এ বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। যদি তাই হতো তবে নবী-রাসূলগণ এ বিষয়ে অগ্রসর হতেন। কাফেরদেরকে হেদায়েত করার জন্য যখন ইচ্ছা মো'জেযা দেখিয়ে চমক লাগাতেন এবং তখন সবাই হেদায়েত হয়ে যেত। এজন্য কাফেররা অনেক সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে অবাস্তব কিছু আবদার পেশ করত কিন্তু নবীজী তার কোন জবাব দিতেন না। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ .

তারা বলে, আমরা কখনই আপনার উপর ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্যে ভূমি হতে এক ঝর্ণাধারা উৎসারিত করবেন। অথবা আপনার হবে খেজুরের কিংবা আঙ্গুরের বাগান যার ফাঁকে ফাঁকে আপনি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবেন নদী-নালা। অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তদানুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলে দিন, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে দেখান। অথবা আপনার হবে স্বর্ণনির্মিত একটি গৃহ্ অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন; অবশ্য আপনার আকাশ আরোহণেও আমারা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না আপনি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবেন যা আমরা পাঠ করব। আপনি বলুন (হে রাসূল!) আমার প্রতিপালক পবিত্র মহান, আমি তো শুধু একজন মানুষ এবং আল্লাহর বার্তাবাহী একজন রাসূল।[] (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৯০-৯৩)

সউদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া বোর্ডের ওলামায়ে কেরাম লিখেছেনঃ কারামত হচ্ছে একটি অলৌকিক বিষয় যা আল্লাহ্ তাআলা পূণ্যবান বান্দার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। উক্ত বান্দা জীবিত হোক বা মৃ ত হোক। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁকে বিপদমুক্ত করা, উপকৃত করা বা তাঁর মাধ্যমে সত্যের বিজয় ঘটানো। কারামতের এই বিষয়টিতে নেক বান্দার কোন হাত নেই যে, তিনি ইচ্ছা করলেই কারামাত দেখাতে পারবেন। যেমনটি মো'জেযা দেখানোর ব্যাপারে নবী-রাসূলদের নিজের কোন ক্ষমতা ছিল না। এসব কিছুর মালিক ও কর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তিনি বলেন, وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ তারা বলে, তার (নবীর) পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী [illegible] (সূরা আনকাবূতঃ ৫০)[১]

[১] . ফতোয়া লাজনা দায়েমা ২/২৩৭

মারেফতের পীর-ওলীদের মর্যাদা নবীদের চেয়েও বেশী!

জনাব চরমোনাই পীর সাহেবের মতে মারেফতের পীররা নবীদের চাইতে উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারেন; বরং তার দাবী মতে মারেফত পন্থী একজন সাধারণ মূর্খ লোক যে স্তরে পৌঁছতে পারে তা নবীদের পক্ষেও সম্ভব নয়। তিনি লিখেছেনঃ *হে মু্‌মিন ভাই সকল! এখন বুঝিয়া লউন যে, মূর্খ লোক মা'রেফতের উপরের দরজায় পৌঁছতে পারে কিনা এবং ইহাও খেয়াল করুন যে, মা'রেফতের রাস্তা কত বড় কঠিন ও কত গোপন, যেখানে মূছা (আঃ)এর মত অত বড় পয়গাম্বরও একজন সাধারণ রাখালের হাল বুঝিতে পারেন নাই।* (আশেক মাশুক ৮৮-৯০ পৃঃ)[১]

---

[১] . এই উক্তির পূর্বে পীর সাহেব কপোলকল্পিত, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্ভট একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটি পড়লে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবীর শানে চরম বেয়াদবী ও ধৃষ্টতারই প্রমাণ মেলে। নবী-রাসূলদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন আলেম তো দূরের কথা সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এধরণের কুরুচীপূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করা মোটেও শোভনীয় নয়।

ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ "মূসা (আঃ) একদিন পথ চলছিলেন, এমন সময় দেখেন জনৈক রাখাল ধ্যানমগ্ন হয়ে গুনগুন করে বলছিলঃ ওগো আল্লাহ্ তোমারে যদি পাইতাম সাবান দিয়া গোসল করাইতাম, মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতাম, আতর-সুরমা লাগাইয়া দিতাম...। এসব শুনে মূসা (আঃ) তাকে ধমক দিলেন, কি আজে-বাজে বকছো? এগুলো তো শেরেকী কথা। রাখাল ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা

সম্মানিত পাঠক! এই উক্তি দ্বারা জনাব পীর সাহেব মানুষকে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলঃ

১) আল্লাহকে চেনা ও পাওয়ার পথে শরীয়ত পন্থী মূসা (আঃ)এর চাইতে মারেফত পন্থী রাখালের জ্ঞানই বেশী, রাখালের মর্যাদাই অধিক! কেননা আল্লাহকে পাওয়ার পথে রাখাল যতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে, মূসা (আঃ) তার কুলকিনারাই পাননি! রাখাল আল্লাহর যত নিটকবর্তী হতে পেরেছে মূসা (আঃ) তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেননি! অতএব মূসা (আঃ)এর মত নবী যে হাল বুঝতে পারেন না, যে নবী আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী (?) কথাবার্তাকে শির্কী কথা বলে প্রতিবাদ করেন, সেই নবীর অনুসরণ করার কোন দরকার আছে কি? বরং সেই রাখালদের পথ ধরে তাদের হাতে মুরীদ হলেই তো আল্লাহকে পাওয়া যাবে, তাঁর আশেক হওয়া যাবে, তাঁর দীদার লাভ করা যাবে, তাঁর নূরে গরক হয়ে সেদরাতুল

মূসা (আঃ)কে ডাক দিয়ে তিরস্কার করলেন এবং জানালেন রাখালের কথায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। মূসা (আঃ) পয়গম্বরী হারানোর ভয়ে রাখালকে খুঁজে বের করে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তখন রাখাল জানালো সে সিদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে আরশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছিল। কিন্তু তিনি তাকে বাধা দিয়ে আল্লাহর দীদার হতে বঞ্চিত করলেন।" এরপর চরমোনাই পীর সাহেব উল্লেখিত মন্তব্য পেশ করেনঃ

মুন্তাহায় পৌঁছা যাবে। অতএব যে শরীয়তের জাহেরা পথে চলে আল্লাহর দীদার পাওয়া যায় না, আল্লাহকে চেনা যায় না, আল্লাহর সাথে প্রেমালাপ করা যায় না, সে পথে চলারও দরকার পড়ে না এবং সে পথের প্রতি আহ্বান করারও দরকার নেই। ঐ জন্যেই মনে হয় ইমাম রাজীর পীর সাহেব ইমামকে মা'রেফতের পথে দিক্ষীত করার পূর্বে একবছর কিতাব দেখতে বারণ করেছিলেন।[১] কারণ কি? কারণ সুস্পষ্ট- একবছর কিতাব না দেখলে তিনি ইসলাম ভুলে যাবেন, অন্তর থেকে ইলম মুছে যাবে আর সেখানে মূর্খতা জড় গেড়ে বসবে। তখন সেই ইলম শুন্য মূর্খ হৃদয় মারেফত নামক ধোকাবাজীর জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করা যাবে। এই জন্যেই পীর সাহেবরা মানুষকে তাওহীদ ও সুন্নাত বা কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার চাইতে মা'রেফতের জ্ঞানের প্রতিই বেশী আহ্বান করে থাকেন- যে জ্ঞানের কোন পরিচয় নেই, নেই কোন নীতিমালা, নেই কোন দীলল-প্রমাণ ও বই-পুস্তক।

---

[১] . ঘটনাটি দেখুন ৪৭-৪৮ পৃঃ।

২) পীর সাহেব উল্লেখিত উক্তি দ্বারা পরোক্ষভাবে মানুষকে নবী-রাসূলদের অনুসরণ থেকে বিরত রেখে মা'রেফতের পীরদের অনুসরণের প্রতি আহ্বান করেছেন। ইঙ্গিত করেছেন যে, নবীদের চাইতে পীরেরাই আল্লাহকে অধিক চেনেন এবং আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হতে পারেন। এই কারণে তাদের মতে শরীয়তের আমল-আখলাকগুলো শুধু লেবেল। আল্লাহকে পাওয়ার আসল ও আভ্যন্তরীন মাল-মসলা ও পদ্ধতি একমাত্র তাদের কাছেই আছে! তারা ঐ রাখালদের পথে চলে তাদের সিনা বসিনায় (অন্তর থেকে অন্তরে) চলে আসা মারেফতের গূঢ় তত্ব লাভ করে থাকেন, এজন্যে শরীয়তের বাহ্যিক বিষয় সমূহ তাদের কাছে শুধু লোক দেখানো কিছু আমল। এই কারণে দেখবেন (আমাদের দেশে) শরীয়তের জ্ঞানে পারদর্শী (দাওরায়ে হাদীছ বা টাইটেল পাশ করেও) আলেম সমাজ ঐ সিনা-বসিনায় চলে আসা মারেফতী জ্ঞান পাওয়ার উদগ্র বাসনায় ছুটে চলেন নামধারী পীর সাহেবদের খানকা ও দরবার শরীফে। ধন্য করেন পীর সাহেবদের পদসেবা করে নিজের জীবনকে। এই কারণে তো মা'রেফতের জ্ঞান মূলতঃ

কী সে সম্পর্কে কেউ কোন ধারণা দিতে পারেন না। সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তার উত্তর হচ্ছে পীর সাহেব। অর্থাৎ পীর মানেই মারেফত। আর পীর না থাকলে মারেফত নেই। এ জন্যে ইসলামী শরীয়তের উপর যত বই-কিতাব লিখা হয়েছে, তার বিপরীতে এলমে মারেফতের কোন পুস্তক আছে কি?

আমরা জানি معرفة (মা'রেফত) শব্দটি আরবী, তার অর্থ চেনা বা জানা। একজন মানুষ কোন বিষয় সম্পর্কে জানলে বা চিনলে তার মা'রেফত হাসিল হল। আল্লাহকে চেনা ও জানার জন্য তাঁর প্রদত্ব কিতাব ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত ব্যতীত তৃতীয় কোন রাস্তা নেই। এজন্যেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে বলেছিলেনঃ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ আমি তোমাদের জন্যে দুটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে থাকবে (অর্থাৎ তার অনুসরণ করবে) কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি

হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অপরটি হচ্ছে তাঁর নবীর সুন্নাত তথা জীবনাদর্শ।[১]

৩) এখানে আরেকটি কথা পরিস্কার যে, নবী-রাসূলের পথে না চলেও আল্লাহকে পাওয়া যায় সে কথার প্রতি পীর সাহেব ইঙ্গিত করেছেন। অন্যথা এরকম সনদ বিহীন একটি উদ্ভট মিথ্যা ঘটনা উল্লেখ করার কী কারণ থাকতে পারে? পীর সাহেব মূলতঃ এই আকীদা তার পূর্বসূরী বিভ্রান্ত ইবনে আরাবীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেনঃ ইবনে আরাবী তার রচিতঙফুসুস নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ আল্লাহর ওলীগণ কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশ পান। আর নবীগণ ফেরেশতার মাধ্যমে নির্দেশনা লাভ করে থাকেন। তার এই কথা মিথ্যা ও বাতিল। কেননা কোন ওলী আল্লাহর নির্দেশনা লাভ করতে পারেন না, তাঁর কাছে প্রেরীত নবী-রাসূলের মাধ্যম ছাড়া। অবশ্য ওলীর কাছে যদি কোন

---

[১] . মুআত্বা মালেক হা/ ১৫৯৫

বিষয়ে এলহাম[১] হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু সেই এলহামের সত্যতা যাচাই করতে হবে কুরআন-সুন্নাহর মাপকাঠিতে।[২] কেননা নবী-রাসূল ছাড়া পৃ থিবীতে কোন যুগে কোন মানুষ সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। অতএব কারো কাছে কোন বিষয়ে এলহাম হলে, সেই এলহাম সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে না শয়তানের পক্ষ থেকে তা যাচাই করবেন কিভাবে?[৩] তা যাচাই করার জন্য নবী-রাসূলের কাছে প্রেরীত বিধানের মাপকাঠিতে তাকে

---

[১] . আল্লাহর পক্ষ থেকে মনের মধ্যে কোন বিষয় জাগ্রত হওয়াকে এলহাম বলা হয়।

[২] . মাজমু' ফাতাওয়াঃ ১/১৪৯

[৩] . একমাত্র নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ শয়তান থেকে নিরাপদ নয়। চাই তিনি ওলী হোন বা অন্য কেউ। এই কারণে ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার পরও আশংকা করতেন যে, হয়তো তিনি নিজের অজান্তে মুনাফিকী কর্ম করে ফেলেছেন কিনা? এজন্যে তিনি হুযায়ফা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আমার মধ্যে কি মুনাফেকের কোন আলামত বিদ্যমান আছে? হুযায়ফা বলেছিলেন, না নেই। আপনার পর আমি আর কাউকে এধরণের প্রশ্নের জবাব দেব না। (উল্লেখ্য যে, হুযায়ফা (রাঃ)এর নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনাফেকদের পরিচয় ও তালিকা গোপনে প্রকাশ করেছিলেন এবং তা কারো সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন।)

তাবেঈ ইবনে আবী মুলাইকা বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীদের মধ্যে থেকে তিরিশ জন এমন সাহাবীকে আমি পেয়েছি, যাঁরা সকলেই মুনাফেক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে অশংকা করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ দাবী করতেন না যে, আমার ঈমান জিবরাঈল বা মিকাঈল (আঃ)এর ঈমানের ন্যায়।" (বুখারী)

যাচাই করে নিতে হবে। তার অনুকুলে হলে গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত হবে। যাচাই করার দরকার না হলে তো যে কেউ দাবী করতে পারে যে, আমার কাছে এলহাম হয়েছে।

কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে পাওয়ার জন্য নবী-রাসূলদের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন পথ নির্ধারণ করেননি। কেননা তিনি তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য। কোন্ কাজে তিনি খুশি হন এবং কোন্ কাজে নাখোশ হন মানুষকে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য। এজন্য তিনি সাধারণ মানুষের কাছে শরীয়ত তথা আদেশ-নিষেধ বা ইবাদত সম্বলিত কোন ওহী নাযিল করেননি।

আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾

কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, ওহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার অন্তরালে অথবা দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁরই অনুমতিক্রমে দূত (জিবরীল বা অন্য ফেরেশতা) ওহী আনয়ন করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।] (সূরা শূরাঃ ৫১)

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুরসণ ছাড়া কোন মানুষ পরিপূর্ণ আল্লাহর ওলী হতে পারে না; বরং যে যত বেশী শরীয়তের অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে সে তত বড় আল্লাহর ওলী। কেননা আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, যাকে ওলী বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন তাকেই তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার তাওফীক দান করেন। আর সেই ওলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁদের কাছে যা নাযিল হয়েছে জাহেরী-বাতেনীভাবে তারই অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের জন্যে অপরিহার্য।

নবী-রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন, যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তার সবকিছুকে বিশ্বাস করা ও আমল করা আবশ্যক এবং তাঁদের বিধি-বিধান বাদ দিয়ে কোন ওলীর অনুসরণ হারাম সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা আমাদের নিকট নাযিল করা হয়েছে তার উপর। আরো যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের নিকট এবং মূসা ও ঈসাকে যা প্রদান করা হয়েছে এবং অন্যান্য নবীগণ তাঁদের প্রভু হতে যা প্রদত্ব হয়েছিলেন তদ সমুদয়ের উপর ঈমান এনেছি। তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা প্রভেদ করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (সূরা বাকারাঃ ১৩৬)

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তারই অনুসরণ কর, তা ব্যতিরেকে কোন ওলী-আউলিয়ার অনুসরণ কর না। (সূরা আরাফঃ ৩)

ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন,ও কোন মানুষ যদি ধারণা করে যে, অন্তরের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে নবুওতের সম্মান লাভ করা যায়, অথবা বিশ্বাস করে যে, কোন কোন ওলী নবী থেকে উত্তম,

অথবা বলে যে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা এসে থাকে- যদিও সে নবুওতের দাবী না করে, তবে এ ব্যক্তি কাফের ও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। মুসলিম শাসকের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাকে হত্যা করা।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ ইমাম গাজালী (রহঃ) সুস্পষ্টরূপে একথা উল্লেখ করেছেন যে, কোন মানুষ যদি নবুওতের মর্তবার উপরে বেলায়াতের মর্তবাকে উচ্চ দাবী করে, তবে তাকে হত্যা করা আমার নিকট একশত কাফেরকে হত্যা করার চাইতে অধিক পছন্দনীয়। কেননা এই ব্যক্তি দ্বারা দ্বীনের ভয়ানক ক্ষতি সাধিত হবে।[২]

শেষ কথাঃ তাওহীদের আলোচনার শেষ নেই। আল্লাহ্ যেমন আছেন- তিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী, তাঁর তাওহীদও তেমন বিদ্যমান- অক্ষয়, অমলিন, চিরকালীন। অপর দিকে এই পৃ থিবীযতকাল থাকবে আল্লাহ্ এবং তাঁর তাওহীদের বিরুদ্ধে শয়তান ও তার

---

[১] . আল যাওয়াজের আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের ১/৬৬ পৃঃ।

[২] . মাজমু ফাতাওয়া ৪/১০৪ পৃঃ

দোসরদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। মুমিন বান্দা এদের বিরুদ্ধে জদ্দো-জিহাদ করে আল্লাহর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট থাকবে, যেমন করে নবী-রাসূলগণ তাওহীদের বাণীকেই সমুন্নত করার জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলিয়ে গেছেন। আল্লাহর অধিকার আদায় করার জন্য অক্লান্তভাবে অবিরাম পরিশ্রম করেছেন।

আমরা বক্ষমান পুস্তকে যে আলোচনা উপস্থাপন করলাম তার সারসংক্ষেপ হচ্ছেঃ

১) আল্লাহ্ তাআলা মানব-দানবকে একমাত্র তাঁর ইবাদত তথা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সৃ ষ্টিকরেছেন।

২) তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশুদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই সকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাওহীদ মুখী করতে হবে। তাওহীদের বই-পুস্তক পাঠ্য সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যাতে করে তাওহীদ ও শির্কের মাঝে পার্থক্য জানা যায়। কেননা বর্তমানে অসংখ্য শির্ক ইসলামের লেবাস ধারণ করে মুসলমান সমাজে বিরাজ করছে।

৩) শির্ক ও বিদআত চর্চা পরিত্যাগ করে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীছের আলোকে তাওহীদ ও সুন্নাতের চর্চা করতে হবে।

৪) কবর ও মাজারের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই; বরং এসব নিয়ে গবেষণা-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে শির্কের দরজা উন্মুক্ত হবে। অতএব মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনা ও নিজের মরণকে স্মরণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা যাবে না।

৫) অতিভক্তি শির্কের গোড়া পত্তন করে, তাই কোন মানুষের প্রতি অতিভক্তি, অতিশ্রদ্ধা, অতিরঞ্জন থেকে সাবধান থাকতে হবে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিয়েও বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তিনি বলেছেন, যেমন করে খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ)কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে; তোমরা আমাকে নিয়ে অনুরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা। তাই তোমরা আমাকে বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।' (সহীহ্ বুখারী)

৬) ইসলামে পীর-মুরিদী ব্যবস্থার কোন স্থান নেই। নিছক স্বার্থ সিদ্ধি তথা ব্যবসার উদ্দেশ্যেই এই প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে। অতএব সকল পীর থেকে সাবধান।

৭) প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব খাঁটি ঈমান ও সহীহ হাদীছ মোতাবেক সঠিক আমল তার নাজাতের উসীলা বা মাধ্যম। মানুষ মানুষের উসীলা হতে পারে না।

৮) দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ আল্লাহর কাছেই আছে। অতএব সরাসরি একমাত্র তাঁর কাছেই তা প্রার্থনা করতে হবে; অন্য কারো কাছে নয়। কারো মাধ্যমে নয়, কারো উসীলায় নয়।

৯) প্রত্যেক ঈমানদার, মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী- যদিও কোন মানুষ তাকে না চেনে। ওলী হওয়ার জন্য বিশেষ কোন বাহ্যিক আলামত, ব্যবস্থাপনা ও আড়ম্বরের দরকার নেই।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার তাওহীদের মর্ম উপলব্ধি করার জ্ঞান দাও। হৃদয়ে তাওহীদ ধারণ করে তার উপর বাঁচিয়ে রাখ এবং জীবন পরিচালনা করার

তাওফীক দাও। মৃত্যুর সময় তাওহীদের বাণী পাঠ করার সুযোগ দিও। আর তাওহীদের প্রতিদান স্বরূপ আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিও। আমীন॥

রজব, ১৪৩১ হি মোতাবেক

জুন, ২০১০ খৃষ্টাব্দ।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

===